একটি বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লিউসিভ!
সুমন্ত আসলাম
ভূতবন্ধু

অদ্ভুত একটা বন্ধু জর্জের–ভূতবন্ধু। একটা পা নেই জর্জের। এই ভূতবন্ধুটা অনেক কাজ করে দেয় তার। মাঝে মাঝে গল্পও করে তার সঙ্গে। একদিন জর্জের এই প্রিয় বন্ধুটা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কেন?

ফাঁকিবাজ অনেক ছেলে আছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু ইফতি আর রিচির মতো ফাঁকিবাজ কেউ আছে কি? ওরা এতই ফাঁকিবাজ যে, ওদের শিক্ষক ওদের ছেড়ে পালিয়ে যায়।
কী ভয়ানক কাণ্ড!

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় রুদ্রের। কে যেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রুদ্র জিজ্ঞেস করে, কে? কথা বলে না কেউ। কিন্তু মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত ছুরিটা কার?

সুমর্মির বাবা সুমর্মিকে শাস্তি দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অদ্ভুত, অন্যরকম একটা শাস্তি দেবেন তাকে। কিন্তু শাস্তি এরকম কখনো হয়!

জন্মদিন হয়, কিন্তু কখনো কি জন্মরাত হয়? জর্জের তাই হয়েছিল। কিন্তু জন্মরাত এত ভয়ঙ্কর হয়, এত হৃদয় কাঁপানো হয়!

স্কুলের কাঁঠাল গাছ থেকে কাঁঠাল চুরি হয়েছে। কিন্তু কেউ ধরতে পারছে না চোরটা আসলে কে? অবশেষে জর্জকে ডাকলেন হেডস্যার। খুব সুন্দরভাবে চোর বের করে ফেলল জর্জ। কীভাবে?

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

Banglapdf.net

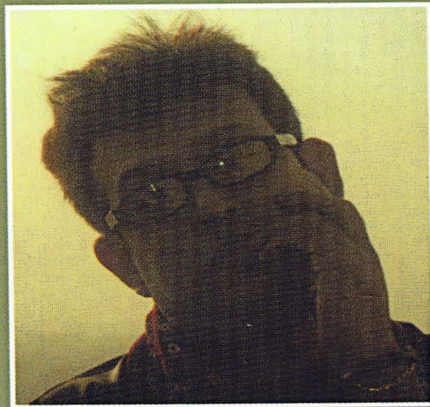

কেউ কেউ বলেন, সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে যারা স্বপ্নপূরণের পথে এগোয়, তারা ক্রমে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ আর স্বার্থপর। এই কথাগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে হাজার ব্যস্ততার মাঝেও সুমন্ত ঠিক ঠিক হাজির হয় আমাদের নিজস্ব আড্ডার জগৎ 'জলছায়া'তে। বুড়ো বটগাছের শরীরজুড়ানো ছায়ায় ক্লান্তি মুছে নিতে নিতে শোনে জীবনের গল্প, শোনায়ও। আমরা যখন নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে মেলাতে ক্লান্ত, তখন অসহায় ও বঞ্চিতদের জন্য কিছু একটা করার তাগিদে সুমন্ত গড়ে তোলে–'কৃষ্টিক'। এভাবে স্বপ্নপূরণের পথে আরেক ধাপ এগোয় ও। আর আমরা ওর পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত হই, সেই সঙ্গে গর্বিতও।

একা একা বসে থাকা, একা একা হেঁটে বেড়ানো, একা একা চুপচাপ ভাবতে থাকা সুমন্ত সবার জন্য ভাবে–সবার জন্য। পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্যটি থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ অপরিচিত অনাত্মীয়ও বাদ যায় না তার ভাবনার ব্যপ্তি থেকে। তার বন্ধুত্ব আর সহযোগিতার হাত ঠিক ঠিক পৌঁছে যায় যেখানে প্রয়োজন সেখানে। আর দিন শেষে তার প্রাপ্তির ঝুলিতে জমা হয় ভালোবাসা–অসংখ্য মানুষের সীমাহীন ভালোবাসা।

এ সকল ভালোবাসা আর শুভকামনাগুলো সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে একসময় নিজের ঘরে ফেরে সুমন্ত। আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মেটাবে বলে হাতে তুলে নেয় কাগজ কলম। তার অভিজ্ঞতা, অনুভব আর মতামতগুলো তুলে ধরে গল্প–উপন্যাসে। সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর আমরা অংশীদার হই তার সেইসব অনুভবের। আমাদের মুগ্ধতার প্রতিউত্তরে কেবল একটু মিষ্টি করে হাসে সুমন্ত। সেই অলৌকিক ব্যাখ্যাতীত হাসিতে আমাদের আরও বেশি মুগ্ধ করে সে ফিরে যায় নিজের জগতে–যেখানে ওর উপস্থিতিতে মুখ তুলে চায় দুটো গোল্ডফিশ, টিউটিউ ডেকে ওঠে ঘরের কোনে বাসা বাঁধা দুটো চড়ুই। সুমন্ত যে ওদেরও একজন, খুব কাছের একজন।

–কাছের বন্ধুরা

সুমন্ত আসলাম

ভূতবন্ধু

প্রকাশনার তিনদশকে
প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

©
লেখক

প্রচ্ছদ
সুহর্ষ সৌম্য

বর্ণবিন্যাস
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
১০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70152-0180-7

VOOT BONDHU by Sumanto Aslam
Published by Milan Nath, Anupam Prokashoni
38/4 Banglabazar Dhaka-1100
Price : Tk. 100.00 Foreign US$ 5.00

ঢাকায় তখন প্রথম এসেছি। টুকটাক লেখালেখি করি। হঠাৎ একটা পত্রিকা চোখে পড়ল—কিশোর পত্রিকা। সেবা প্রকাশনী থেকে বের হয়। পত্রিকাটির দায়িত্বে আছেন একজন। একটা গল্প লিখে তাঁর কাছে চলে গেলাম একদিন হঠাৎ। যে ভয়, যে দুরু দুরু বুক নিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁর আন্তরিক কথোপকথন, প্রগাঢ় হৃদ্যতা এক নিমিষেই দূর করে দিল সব এবং একদিন আমার জীবনের প্রথম কিশোর গল্প ছাপা হলো তাঁর হাতের ছোঁয়ায়!

প্রিয় টিপু ভাই, প্রিয় টিপু কিবরিয়া

আপনার মনে আছে—প্রথম দেখার দিন আপনি আমাকে চিটাগাং হোটেলে চা আর পুরি খাইয়েছিলেন? আহারে, পৃথিবীর সব সম্পাদক যদি আপনার মতো হতেন, আপনার মতো হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে সব নবীন লেখককে ঠাঁই দিতেন!

প্লেটো জিজ্ঞেস করলেন, 'সর্বোচ্চ দেশপ্রেম কী?'
সক্রেটিস উত্তর দিলেন, 'সবচেয়ে সুন্দরভাবে নিজের কাজটুকু করা।'

ভূতবন্ধু

বড্ড মন খারাপ জর্জের। অতি প্রিয় বাড়িটা ছেড়ে আজই তারা এই নতুন বাড়িতে এসেছে। তার বাবা সরকারি চাকরি করেন। দু'তিন বছর পরপরই তাকে বদলি হতে হয়। বাসাও বদলাতে হয়।

জানালার পাশে বসে আছে জর্জ। বিকেল হয়ে গেছে। পাড়ার ছেলেরা দূরে একটা মাঠে ফুটবল খেলছে। তারও ভীষণ ইচ্ছে করছে ফুটবল খেলতে। কিন্তু নতুন জায়গা, নতুন ছেলের দল। তার চেয়ে বড় কথা—তার যে একটা পা নেই।

দু'বছর আগে একদিন স্কুল থেকে ফিরছিল জর্জ। হঠাৎ একটা ট্রাক এসে চাপা দিল তাকে। তার আর কিছু মনে নেই তারপর। তিনদিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখে একটা পা নেই তার। অসম্ভব পিপাসা পেয়েছে। কিন্তু পানির গ্লাস আর জগটা একটু দূরে টেবিলের ওপর। পানি খেতে হলে হয় তাকে জানালার পাশ থেকে ক্র্যাচে ভর দিয়ে উঠতে হবে, না হয় মাকে ডাকতে হবে। কিন্তু জর্জের কোনোটাই করতে ইচ্ছে করছে না। যদিও গলাটা ভীষণ শুকিয়ে গেছে।

খুট করে একটা শব্দ হলো।

পাশ ফিরে তাকাল জর্জ। জানালার পাশে টুলটার ওপর পানির গ্লাস আর জগ। জর্জ হাত দিয়ে চোখ দুটো কচলাল। ভূত দেখছে না তো? কিছুক্ষণ আগেও যা টেবিলের ওপর ছিল, তা কেমন করে এই টুলে এল? আশপাশে তাকাল, না কেউ নেই। কেউ এলে অবশ্যই তার নজরে পড়ত। আর ভাবতে পারছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢক ঢক করে গিলে ফেলল। এ সময় জর্জের মা এলেন।

'কিরে, পানি খাচ্ছিস? আমাকে ডাকলেই পারতিস।'

'তুমি কি-না কী করছ, তাই ডাকলাম না।'

'অযথা কষ্ট করতে গেলি, টেবিল থেকে আমিই পানি এনে দিতাম।'

কোনো কথা বলল না জর্জ। আর বলবেই বা কী? টেবিল থেকে সে কিছুই আনে নি, আর তাই কষ্টও হয় নি। সে নিজেই জানে না কী দিয়ে কী হয়েছে। মাকে কিছু বলবে? না থাক। ভাববেন, পাগল হয়ে গেছে।

'কিছু বলছিস না যে?'

'কী বলব, ভালো লাগছে না।'

'তোর খুব কষ্ট হয়রে জর্জ, তাই না?'

'কই, না তো?'

'তুই ভাবছিস, আমি কিছু বুঝি না। তুই খেলতে পারিস না, বেড়াতে পারিস না।' জর্জের মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

'তুমি কাঁদছ মা?'

'না, তোর কি এখানে খারাপ লাগছে?'

'না, বেশ ভালোই লাগছে।'

'তুই একটু বস, আমি তোর জন্য দুধ নিয়ে আসি।'

'না মা, আমি পরে খাব।'

'ঠিক আছে, যখন খেতে ইচ্ছে করে বলিস কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

'এখন যাই।' মা জর্জের চুলগুলো আলতোভাবে নেড়ে চলে গেলেন।

দুই.

রাত সাড়ে দশটা। ঘুম আসছে না জর্জের। টিভিতে দ্য উইজার্ড দেখে তারপর খেয়ে বিছানায় এসেছে। কেন যেন ঘুম আসছে না। সারাক্ষণ বিকেলের কথা ভেবেছে। কী করে এমন হলো? মনে মনে ভাবছে, যদি ওই 'দ্য উইজার্ড'-এর বেঁটের মতো জাদু জানত, তাহলে সে অনেক কিছু করতে পারত।

'মা।' জর্জ ডাকল।

মা পাশের ঘর থেকে বললেন, 'কী?'

'একটি বই দিয়ে যাও না।'

মা জর্জের ঘরে এসে বললেন, 'রাত অনেক হয়েছে, বই পড়ার দরকার নেই, এখন ঘুমা!'

'না মা, ঘুম আসছে না।'

'অ'। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জর্জের মা। ইদানীং কেন যেন সামান্য কারণেই তার চোখে জল আসে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেই, তুই ঘুমা।'

'একটু পড়ি মা, পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

'কোন বইটা দেব?'

'ওই যে "তিন গোয়েন্দার গোরস্থানে আতঙ্ক" বইটা।'

'না, রাত করে এ বই পড়ে কাজ নেই, ভয় পাবি।'

'না মা, এই তিন গোয়েন্দার বই পড়েই আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই। তুমি তো তিন গোয়েন্দা পড় না। পড়লে জানতে আমাদের কিশোর পাশার কত বুদ্ধি আর কত সাহস।'

'কে বলল আমি পড়ি না? সেদিন তো তোর কাছ থেকে 'মমি' বইটা নিয়ে পড়লাম। যা ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু খুব ভালো লেগেছে।'

'সত্যি? জান মা, মাঝেমধ্যে আমার অনেক দূরে যেতে ইচ্ছে করে, অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু...?' মাথা নিচু করে ফেলল জর্জ।

কিছুক্ষণ কোনো কথা হলো না। দেয়াল ঘড়িটা টিক্ টি্ করে শব্দ করছে। জর্জের মা কিছুক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন। এগারটা বাজার সংকেত হলো ঘড়িতে।

'অনেক রাত হলো, বইটা কোথায় রেখেছিস?'

'টেবিলের ড্রয়ারে।'

জর্জের মা অনেক খুঁজেও বইটা পেলেন না। এখানে-ওখানে দেখে তারপর হতাশ হয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

জর্জ শোয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। বালিশে মাথা রাখবে, ঠিক তখনই সে দেখতে পেল বইটা। বালিশের পাশে রয়েছে। জর্জের স্পষ্ট মনে আছে, সে বইটা ড্রয়ারে রেখেছিল। তারপর আর বের করে নি। কিন্তু বইটা এখানে এল কীভাবে? গা-টা কেমন ছম ছম করে উঠল তার।

খটাস করে লাইটের সুইচে শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে লাইটটা অফ হয়ে গেল। ঘরের ভেতর কালো অন্ধকার। জর্জ চিৎকার করতে যাবে; কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না।

বালিশে মাথা রেখে শুয়ে রইল কোনোভাবে সে। ঘুম আসছে না। গা-টা শির শির করছে। কে যেন মাথার চুলে আস্তে আস্তে হাত বোলাচ্ছে। কিন্তু কে দিচ্ছে সে কিছুই দেখতে পারছে না, বুঝতেও পারছে না।

একটা গরম নিশ্বাস মুখে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল জর্জ।

তিন.

পাখির কিচিরমিচির ডাকে ঘুম ভাঙল জর্জের। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই তার টুথব্রাশ এবং পেস্ট চাই। আজ বেশ সকালেই ঘুম ভেঙেছে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। তাই কাউকে ডাকল না। কিন্তু টুথব্রাশ এবং পেস্ট দরকার। ক্রাচ ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল জর্জ। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে কে যেন রেখে গেছে। ব্রাশ ভেজা, মানে এইমাত্র রেখে গেছে।

কিন্তু কই, কেউ তো এখনও জাগে নি। তবে কে রাখল? হঠাৎ রাতের কথা মনে পড়ল। জর্জ ভীষণ ভয় পেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এসে গেল তার।

'তুমি কাঁদছ?'

জর্জ আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। কেউ নেই। ভাবল ভুল শুনেছে।

'তুমি আমার কথা শুনতে পেয়েছ?'

'কে?'

কোনো উত্তর নেই। জর্জ আবার বলল, 'কে?'

'আমি জীম।'

'জীম! জীম কে?' জর্জ জিজ্ঞাসা করল।

'আমি...,মানে..., আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।'

'কিন্তু তুমি কোথায়, তোমাকে যে আমি দেখতে পাচ্ছি না?'

'আমি তোমার পাশেই আছি, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, কারণ আমি যে ভূত।'

'ভূত'! জর্জ চমকে উঠল।

'ভয় পেলে?' জীম জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি ভূত আর আমি ভয় পাব না?'

'না, তুমি ভয় পেয় না, আমি সত্যি তোমার বন্ধু হতে চাই।' জীম খুব নরম সুরে বলল।

'ভূত আর মানুষ কি কখনও বন্ধু হয়?' জর্জ জীমকে বলল।

'কেন হয় না? মানুষ ইচ্ছে করলে সব পারে, তুমিও পার, বন্ধু।'

'তুমি আমাকে বন্ধু বলছ কেন, আমি তো তোমাকে বন্ধু করি নি।'

'এখন কর।' জীম হেসে বলল।

'কে-রে জর্জ, কার সঙ্গে কথা বলছিস?' জর্জের মা পাশের ঘর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

হঠাৎ জীম জর্জের কানের কাছে এসে চুপি চুপি বলল, 'কাউকে কিছু বলো না, বন্ধু।'

'কেন'?

'সেটা পরে বলব, আগে বলো তুমি আমাকে বন্ধু করেছ?'

জর্জ একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, করলাম।'

'থ্যাংকু বন্ধু, এখন আসি আবার কথা হবে।'

জীমের কথা বন্ধ হলো। তারপর জর্জ দেখল, জানালার পর্দাটা হঠাৎ দুলে উঠল তার। হয়তো জীম চলে গেল। বসে বসে ভাবতে লাগল জর্জ।

'কিরে, কার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

মা কখন যে ঘরে এসেছেন টেরই পায় নি জর্জ। কিছু বলার আগেই তিনি আবার বললেন, 'তোকে ব্রাশ কে এনে দিল?'

জর্জ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'কেন আমি এনেছি?'

জর্জের মা মিটি মিটি হাসছেন, 'একটু অন্যরকম হয়ে গেল না? তোর ঘুম ভাঙার পর আমি অথবা বুয়াই তো ব্রাশ এনে দেয়।'

'হ্যাঁ, তা দাও।'

'তুই অযথা কষ্ট করতে গেলি কেন?'

'না, এতে আবার কষ্ট কি?'

জর্জের মা ঘরের চারদিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার, এত সকালে তোর ঘরটা আবার ঝাড়ু দিল কে? মশারি তো আমিই খুলি, সেটা আবার খুলল কে?'

জর্জ মিটি মিটি হাসছে। সে বলল, 'মনে করো আমি।'

'তা কী করে সম্ভব, মেঝে না হয় ঝাড়ু দিলি, কিন্তু অত উঁচুতে মশারিটা খুললি কেমন করে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

জর্জ মনে মনে ভাবল, তাই তো! সে কি ধরা পড়ে যাবে? না। চট করে সে জবাব দিল, 'ক্র্যাচ উঁচু করে খুলেছি।'

'আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।'

'পাগল।' জর্জ হাসতে হাসতে বলল, 'কিসের সন্দেহ, মা?'

'না-না, ঠিক আছে, আমি তোর নাশতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জর্জ হাসতে লাগল। বেশ ভালোই লাগছে তার। এই একা একা ভাবটা কেটে যাবে। মনে মনে বলল, 'বন্ধু, আমার ভূত বন্ধু।'

চার.

মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে, আজ পাড়ার মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা আছে বিকেল চারটায়। ফাইনাল খেলা আজ। এখন প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে। জর্জের খুব ইচ্ছে হলো, ফুটবল খেলা দেখবে। কিন্তু কাকে নিয়ে যাবে। তার একা যাওয়া ভীষণ অসুবিধে। এতগুলো মানুষের মাঝে ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যাবে। বাবাও নেই। অফিসে। ভীষণ দুঃখ হতে লাগল ওর।

'কি এত ভাবছ, বন্ধু?'

'কে, জীম?'

'হ্যাঁ, বন্ধু।'

'বন্ধু তুমি তো জানো, আজ ফুটবল খেলা আছে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'দেখবে। অবশ্যই দেখবে।' জীম হেসে বলল।

'দেখব! কিন্তু কেমন করে?

'আমার সঙ্গে যে একজনকে যেতে হবে, না হলে মানুষের ধাক্কায় মরে যাব।'

'আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'কিন্তু তুমি তো ভূত, তোমাকে দেখা যায় না, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কেমন করে?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যাবে কিনা, তাই বল?'

জর্জ লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গি করে বলল, 'যাব না মানে? একশ বার যাব।'

'তাহলে চল।'

'কেমন করে?'

'তুমি চোখ বুজে বসে থাকো, আমি না বলা পর্যন্ত খুল না।'

জর্জ চোখ বুজে বসে রইল। কেমন যেন সাঁ-সাঁ একটা শব্দ হচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। প্রায় এক মিনিট পর জীম বলল, 'চোখ খোল, বন্ধু।'

চোখ খুলেই চমকে উঠল জর্জ। এ কী! সে একেবারে মাঠে এসে উপস্থিত। চারদিকে শত শত লোক। মাঠের একপাশে জর্জ বসে আছে। একা। ক্র্যাচটা নিয়ে আসা হয় নি।

'জীম?'

'বলো।'

'আমার ক্র্যাচ কই?'

'ওটার আবার কী দরকার?'

খেলা শুরু হয়ে গেছে। উভয় পক্ষই খুব ভালো খেলছে। হঠাৎ একটা গোল। জর্জদের পাড়ার টিম গোল দিয়েছে। চিৎকার করে উঠল জর্জ।

'জীম, তুমি কি খেলা দেখছ?'

'হ্যাঁ, এই তো তোমার পাশে বসে খেলা দেখছি।'

'দেখলে, আমাদের দলটা কেমনভাবে গোলটা দিল।'

'খুব সুন্দর খেলছে ওরা। বন্ধু, চুইংগাম খাবে?'

'না, থাক।'

'থাকবে কেন, তুমি বসো আমি আনছি।'

জর্জের গায়ে হঠাৎ গরম বাতাস লাগল। কিছুক্ষণ পর জীম বলল, 'বন্ধু, তোমার ডানে তাকাও।'

জর্জ ডান দিকে তাকিয়ে দেখল, দু'প্যাকেট চুইংগাম ঘাসের ওপর পড়ে আছে।

'জীম, তুমি খাবে না?'

'ভূতরা বুঝি খায়?'

জর্জ একটু লজ্জা পেল। ভূতরা যে খায় না তা অনেক আগে বইতে পড়েছিল, কিন্তু মনে ছিল না।

হঠাৎ আরেকটা গোল। এবারও জর্জদের পাড়ার টিম দিয়েছে। জর্জ চিৎকার করে উঠল। আনন্দের চিৎকারে তার মুখের চুইংগামটা পড়ে গেল। কিন্তু জর্জ খেয়াল করল না পাশের বাসার নাজমুল আর মাহমুদ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা বুঝতে পারল না, জর্জ কার সঙ্গে এসেছে। আশপাশে কাউকে দেখছেও না। তবে কি একা এল? ভাবছে, একা একা আসবেই বা কেমন করে? তার ক্র্যাচও দেখা যাচ্ছে না। তারা ভাবল, তার বাবার সঙ্গে এসেছে। কিন্তু আশপাশে কোথাও তার বাবাকেও দেখল না।

মাহমুদ আর নাজমুল ভাবল, জর্জ বোধহয় খুব কষ্ট করে এসেছে। কিন্তু তাদের মনে সামান্য অভিমানও হল। কারণ, জর্জের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে। বললেই তারা তাকে নিয়ে আসত। এমন সময় খেলা শেষ হওয়ার বাঁশি বাজল। মাহমুদ আর নাজমুল দৌড়ে তাদের পাড়ার খেলোয়াড়দের কাছে গেল।

'জীম।' জর্জ ডাকল।

'বলো।'

'চলো না, ওই নদীর পাড়টায় একটু বেড়িয়ে আসি।'

'কিন্তু বন্ধু, দেরি হলে তোমার আম্মা চিন্তা করবেন। তিনি হয়তো ভাবছেন, তুমি ঘুমিয়ে আছ। তাই চল, বাড়ি যাই। অন্য একদিন না হয় নদীর পাড়ে যাব।'

'না, আজই চল। আমার খুব নদী দেখতে ইচ্ছে করছে। যাব আর আসব।'

'ঠিক আছে। চোখ বন্ধ কর।'

জর্জ চোখ বন্ধ করল।

মাহমুদ আর নাজমুল, কি যেন মনে করে জর্জের কাছে ফিরে এল। কিন্তু জর্জ নেই। তারা বুঝতে পারল না, এত ভিড়ের মধ্যে জর্জ এত তাড়াতাড়ি কোথায় গেল?

পাঁচ.

থমথমে চেহারা নিয়ে জর্জের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জর্জের মা। তার চোখে পানি। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'বাবা, তুই বল, কেমন করে মাঠে গিয়েছিলি?

'কে বলল, আমি মাঠে গিয়েছিলাম?'

'মাহমুদ আর নাজমুল তোকে দেখেছে। ওরা কিছুক্ষণ আগে বলে গেল। আমি ভাবলাম ভুল বলছে। কিন্তু তোর ঘরে গিয়ে দেখি সত্যিই তুই নেই। ক্র্যাচটা খাটের পাশে পড়ে আছে।'

মাথা নিচু করে রইল জর্জ। আসলে তারই দোষ। জীম তো তাকে তাড়াতাড়িই পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে-ই তো নদী দেখার বায়না ধরল এবং নদী দেখতে দেখতে প্রায় বিশ মিনিট দেরি করল। দেরি না করলে হয়তো সে তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছে যেত। মা তাহলে তাকে ঘরে দেখতে পেতেন এবং বিশ্বাস করতেন, সে ঘরে ছিল। মাহমুদ আর নাজমুল ভুল দেখছে এটাও বলা যেত। দেরি করেই হয়েছে ভুল।

'বাবা, তুই চুপ করে আছিস কেন, বল?'

জর্জ কি বলবে বুঝতে পারল না। ভাবল মিথ্যে বলবে। কিন্তু মার কাছে যে মিথ্যে বলতে নেই। হঠাৎ টেবিলের ওপর জর্জের মার চোখ গেল। একটা চুইংগামের প্যাকেট।

'এই চুইংগাম আবার তোকে কে এনে দিল?'

জর্জ এবারও কিছুই বলতে পারল না। দুঃখ এবং অভিমানে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

ছয়.

রাত অনেক হয়েছে। জর্জের ঘুম আসছে না। তার কেন যেন বার বার জীমের কথা মনে হচ্ছে। কথা শুনে মনে হয়েছে তার বয়সেরই একটা ছেলে। কেমন করে যে ভূত হয়ে গেল?

কিছুক্ষণ আগে বাবা এবং মা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু জর্জ শুধু চুপ করে থেকেছে। কিছুই বলে নি। শেষে বাবা রাগ করে বললেন, 'যাও, খেয়ে শুয়ে পড়।'

জর্জ না খেয়েই শুয়ে পড়েছে।

'বন্ধু, ঘুমিয়েছ?' জীম বলল।

'না।'

'আমি জানি তোমার মন খারাপ। আমার মনটাও ভীষণ খারাপ হয়ে আছে।'

'তোমার আবার মন খারাপ হলো কেমন করে?'

'আমি বোধহয় তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে পারব না, মিশতে পারব না।'

'কেন?' জর্জ চমকে উঠে বলল।

'তোমার বাবা কাল একজন কবিরাজ আনবেন। তোমার কি হয়েছে তা দেখাবেন।'

'তাতে কি হয়েছে? তোমাকে তো আর সে দেখতে পাচ্ছে না।'

'না বন্ধু কবিরাজরা অনেক কিছু পারে।'

'তাহলে উপায়?'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

হতাশভাবে জর্জ শুয়ে পড়ল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সেও কিছু বুঝতে পারছে না। কোনো উপায়ও তার মাথায় আসছে না।

'বন্ধু কি ভাবছ?'

জর্জ চমকে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না।

'তুমি ভেব না, আমার যাই হোক না কেন, তবুও তোমাকে আমি মনে রাখব। আমি যেখানেই থাকি, তোমাকে স্মরণ করব। আমি ভাবব, সারাক্ষণ ভাবব, আমার একজন বন্ধু আছে।'

জর্জের চোখে পানি এসে গেছে। সে বলল, 'কিন্তু বন্ধু, আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু জানো বন্ধু, বন্ধুর জন্যই বন্ধুর কষ্ট হয়।'

'কিন্তু এভাবে কেন?'

'হয়তো ভাগ্যে এই ছিল, তবে বন্ধু, কষ্টের পরই সুখ আসে।'

'কবে আসবে?'

জীম কোনো উত্তর দিল না। শুধু জানালার পর্দাটা ভীষণভাবে দুলে উঠল।

ফাঁকিবাজ

'আচ্ছা, একটানা কয় ঘণ্টা ট্র্যাফিক জ্যামে বসে থাকতে পারবেন আপনি?' সাইফুল সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেন, 'কিংবা কোনো কিছুর বিল দিতে গিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন একটুক্ষণের জন্য কোথাও না বসে, অথবা কোনো কিছুতে বিরক্তি এলে কতক্ষণ হাসি মুখে থাকতে পারেন আপনি?'

মুখটা হাসি হাসি করে নিয়াজ বলল, 'এসব বলছেন কেন আপনি?'

'কারণ আছে।' সাইফুল সাহেব আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তারপর ইশারা করে নিয়াজকেও তার সামনে রাখা চায়ের কাপটা নিতে বললেন।

কাপটা নিল না নিয়াজ। সে বরং কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কোনো বাচ্চাকে পড়ানোর সঙ্গে ট্র্যাফিক জ্যাম, কোনো কিছুর বিল দেয়া কিংবা বিরক্তির সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্কটা হলো ধৈর্যের।' সাইফুল সাহেব চায়ের কাপটা হাত থেকে সামনে টেবিলে রাখলেন। তারপর নিয়াজের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'আমি গত দু বছরে নয় নয়জন প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলাম আমার দু ছেলে-মেয়ের জন্যে, একজনও দু মাসের জন্য টিকতে পারে নি।'

'কেন?' চোখ দুটো কিছুটা বড় বড় করে বলে নিয়াজ।

'সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না। আপনার টিউশনি ফি'র কোনো সমস্যা না, যত চান দেব। আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আমি আমার ছেলে-মেয়ে দুটোকে এখনই ডাকতে পারি, পরিচয় করিয়ে দিতে পারি আপনার সঙ্গে। আপনাকে নিজেই বুঝে নিতে হবে কেন আগের প্রাইভেট টিউটরগুলো টিকতে পারে নি।'

'আমি ওদের পড়াব কি-না আপাতত সেটা বলতে চাচ্ছি না, তবে আমি ওদের একটু দেখতে চাই।' নিয়াজ কিছুটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতেই বলল।

বাসার কাজের ছেলেটাকে বলতেই দুটো ছেলে-মেয়ে এসে দাঁড়ালো ড্রইং রুমে। সাইফুল সাহেব চেহারাটা শক্ত করে বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এরাই হচ্ছে আমার ছেলে-মেয়ে। একজনের বয়স সাত বছর নয় মাস চারদিন, আরেকজনের বয়স ছয় বছর তিন মাস তের দিন।'

খুব ভালো করে নিয়াজ ছেলে-মেয়ে দুটোর দিকে তাকাল। খুবই নিরীহ গোছের চেহারা। মোটেই দুষ্টু প্রকৃতির মনে হচ্ছে না ওদের। মুখটা হাসি হাসি করে নিয়াজ বলল, 'তোমাদের নাম কি?'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ছেলেটার দিকে একটা আঙুল উঁচু করে বলল, 'ওর নাম ইফতি।' তার পরপরই ছেলেটা মেয়েটার দিকে একই কায়দায় আঙুল উঁচু করে বলল, 'ওর নাম হচ্ছে রিচি।'

'তোমরা নিজেদের নাম কিংবা নিজেদের কথা নিজেরা বলবে, ঠিক আছে?' নিয়াজ দুজনের দিকে আবার হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে বলল, 'এবার বল তো, কোন ক্লাসে পড় তোমরা?'

রিচি ইফতিকে দেখিয়ে বলল, 'ও পড়ে ক্লাস টুতে।' ইফতি রিচিকে দেখিয়ে বলল, 'আর ও পড়ে ক্লাস ওয়ানে।'

'তোমাদের কী বললাম, তোমরা যার যার কথা সে সে বলবে।' নিয়াজ শিক্ষকের মতোই বুঝিয়ে দেয় ইফতি আর রিচিকে।

'না, আমরা সেটা বলি না।' ইফতি বেশ বিরক্তির ভঙ্গি নিয়ে বলে, 'আমরা ঠিক করেছি– আমরা কেউই নিজেদের কথা নিজেরা বলব না। আমার কথা ও বলবে–।' সঙ্গে সঙ্গে রিচি ইফতিকে দেখিয়ে বলে, 'আর ওর কথা আমি বলব।'

নিঃশব্দে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট দুটো মুছে নেয় নিয়াজ। এ কাদের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছে সে। শহরে পড়তে এসে এ পর্যন্ত অনেক ছেলে-মেয়েকে পড়িয়েছে সে, কিন্তু এ রকম ছেলে-মেয়ে বোধহয় এই প্রথম। চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসে নিয়াজ জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, তোমরা কোথায় চড়তে পছন্দ কর– নাগর দোলায়, না কোনো সুন্দর গাছে?'

'ও টিচারের ঘাড়ে চড়তে পছন্দ করে।' ইফতি রিচির দিকে তাকিয়ে বলে। সঙ্গে সঙ্গে রিচিও ইফতির দিকে তাকিয়ে বলে, 'ইফতি ভাইয়াও।' ইফতি আবার শুরু করে, 'টিচারের ঘাড়ে চড়লে কেমন যেন ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ পায় ও।' ইফতি থামতেই রিচি বলে, 'আর ভাইয়া পায় গাধায় চড়ার আনন্দ।'

'তাই?'

'জি, আমরা লাফাতেও পছন্দ করি।'

'কোথায়?' নিয়াজ খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'রিচির পছন্দ টিচারের পেটের ওপর।' ইফতি বলে। 'ভাইয়ার পছন্দ টিচারের পিঠের ওপর।' রিচি বলে।

পেট আর পিঠের ওপর কেমন যেন একটা শিরশিরে ব্যথা বয়ে যায় নিয়াজের। সত্যি সত্যি মহা দুষ্টু ছেলে-মেয়ের পাল্লায় পড়েছে ও। নিয়াজ ওদের দিকে তাকিয়ে আগের মতোই হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা ভেতরে যাও।' রিচি আর ইফতি ভেতরে যেতেই নিয়াজ সাইফুল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি ওদের একটু বাইরে নিয়ে যেতে চাই।'

সাইফুল সাহেব একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কেন?'

'আমি নিজের মাঝে একটা চ্যালেঞ্জ এনেছি আমি ওদের পড়াব এবং ভালোভাবে পড়াব। তার আগে কৌশলে আমার বন্ধু করে নেব ওদের।'

'এখনই নিয়ে যাবে ওদের।'

'জি, এখনই।'

'ওদের মতো মহাপাজির বন্ধু হবেন আপনি কীভাবে?'

'সেটা আপাতত বলতে চাচ্ছি না আমি।'

রিচি আর ইফতিকে ড্রইং রুমে আবার ডেকে আনতেই নিয়াজ বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে বাইরে যাবে?'

'কোথায়?' ইফতি বলে। সঙ্গে সঙ্গে রিচিও বলে, 'কোথায়?'

'চলো, তোমরা যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই নিয়ে যাব।'

বাইরে এসে ঘুরতে ঘুরতে রিচি আর ইফতি দুটো আইসক্রিম, দুটো কোক, চারটা চকলেট, দুটো ক্যাটবেরি শেষ করে নিয়াজকে বলল, 'ভাইয়া, ওই যে মাঠে মেলা হচ্ছে, আমরা মেলায় যাব।'

নিয়াজ খুশি মনে ওদের মেলায় নিয়ে গেল এবং মেলায় ঢুকেই সামনে পেল দুইজন বেলুনওয়ালাকে। ইফতিকে বেলুনগুলো দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা ইফতি, বলো তো ওখানে কতগুলো বেলুন আছে?'

ইফতি গুনে বলল, 'বারোটা।'

'গুড।' নিয়াজ এবার রিচির দিকে তাকিয়ে আরেক বেলুনওয়ালাকে দেখিয়ে বলল, 'রিচি এবার তুমি বলো তো ওই বেলুনওয়ালার কয়টা বেলুন আছে?'

রিচি গুনে বলল, 'সাতটা।'

'গুড।' নিয়াজ এবার ইফতি আর রিচি দুজনকে এক সঙ্গে বলল, 'আচ্ছা এবার বলো তো, বারোটা আর সাতটা– মোট কয়টা বেলুন হল?'

ইফতি বলার আগেই রিচি চিৎকার করে বলল, 'ভাইয়া, বলিস না, আমাদের অঙ্ক শেখাচ্ছে তো!'

মধ্যরাতের আতঙ্ক

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমে ভেঙে যায় রুদ্রের। প্রথমে তেমন কিছু বুঝতে পারে না। হঠাৎ খেয়াল করে দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। ধাক্কাটা আস্তে আস্তে দিচ্ছে, তবুও একটা শব্দ হচ্ছে– ক্যাঁচ ক্যাঁচ। মনে হয় দরজাটা খোলার চেষ্টা করছে কেউ। ঝট করে বিছানায় উঠে বসে সে। ঘরের ডিম লাইটের আলোয় তাকিয়ে দেখে থর থর করে কাঁপছে পুরোন কাঠের দরজাটা।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো রুদ্রের। বুকের ভেতর কাঁপছে। অসহায়ভাবে চারপাশে তাকায় একবার। সবকিছু ঠিক আছে। কোথাও কোনো কিছু নড়ছে না। কেবল দরজাটায় কে যেন খামচাচ্ছে। আঁতকে

উঠল সে। কারণ ছাদের এই একমাত্র ঘরটিতে সে একা। ফুপা, ফুপু ও ডেইজী নিচের তলায়। ফুপুর বাড়িতে এই প্রথম বেড়াতে এসে ছাদের এই ঘরটা তার দারুণ পছন্দ হয়েছে। তাই ফুপা-ফুপুর বার বার নিষেধ স্বত্ত্বেও পুরাতন বাড়ির এই ছাদের ঘরটাতে রাতে ঘুমিয়েছে সে।

ভীষণ ভয়ার্ত গলায় রুদ্র জানতে চাইল, 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। কোনো শব্দ নেই। কিন্তু এক ঝটকা বাতাসে ভেসে এল কর্পূরের তিক্ত-ঝাঁঝাল গন্ধ।

গন্ধটা বাড়ছে। সমস্ত ঘর ভরে যাচ্ছে গন্ধটায়। নাক কুঁচকে গভীর একটা নিশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পা দুটো কাঁপছে। দেওয়ালের পাশে টিউব লাইটের সুইচটায় হাত দেয়ার আগেই থমকে দাঁড়াল। সুইচটা কেমন বড় বড় চোখের মতো হয়ে গেছে। তীব্র একটা নীল আলো বের হচ্ছে সেখান থেকে।

একটু পিছিয়ে এল রুদ্র। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। ছমছম করে উঠল শরীরের ভেতরটা। সুইচের কাছের চোখটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে যাচ্ছে, আলো আরও তীব্র হচ্ছে, কর্পূরের গন্ধটাও বেড়ে যাচ্ছে।

খুব সাবধানে এবং ভীষণ ভয়ে বিছানা থেকে নামল রুদ্র। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ধুক ধুকে ভরে গেছে বুকটা। হঠাৎ পায়ের সাথে কী যেন বাধল। একটু থামল সে। ভীষণ ঠাণ্ডা কী যেন একটা পা পেঁচিয়ে ধরতে চাচ্ছে তার। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ডান পা'টা ছুড়ে মারল রুদ্র। ধপাস করে মেঝের কোণায় পড়ে কী যেন 'ফোস' করে উঠল। গভীরভাবে তাকিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সে। দু'চোখে তীব্র একটা আলো নিয়ে একটি মস্ত বড় সাপ ফসফস করছে আর তার চেরা জিভটা একবার বের করছে আবার ঢুকাচ্ছে।

বুকের ভেতর 'ছ্যাত' করে উঠল। পিঠের মাঝখান দিয়ে কি যেন বেয়ে যাচ্ছে। গুড় গুড় করছে তলপেটটা, ফাঁকা ফাঁকা। তীব্র একটা চিৎকার করতে যাবে রুদ্র, কিন্তু হঠাৎ গলাটা বন্ধ হয়ে এল। কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। মনে হচ্ছে গলাটা কে যেন চেপে ধরেছে।

নিজের গলার ফ্যাস ফ্যাস শব্দে নিজেই চমকে উঠল রুদ্র। কিছুক্ষণ

থেমে থাকল সে। কিছু একটা হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে। টান টান হয়ে গেছে সমস্ত স্নায়ু। কিছু একটা হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

নিঃশব্দে দরজায় হাত রাখল সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে হাতটা ছিটকিনির দিকে। নিশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে রুদ্র। রুদ্ধশ্বাসে কাঁপা কাঁপা হাতটা যখন ছিটকিনির ওপর রাখল, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল সে বিছানার ওপর এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আগুনের মতো গরম হয়ে আছে ছিটকিনিটা।

দুই.

কানের কাছে মুখ এনে কে যেন ফিস ফিস করছে। চমকে উঠে চোখ মেলল রুদ্র, কেউ নেই। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে। প্রথমে কিছু মনে করতে পারল না। পরক্ষণেই কিছুক্ষণ আগের কথাটা মনে হতে শিউরে উঠল সে। চারপাশে চোখটা ঘুরিয়ে দেখল। সব কিছু স্বাভাবিক। কিন্তু একটু খেয়াল করতেই বুঝতে পারল, চারদিকে কিসের যেন 'ফত ফত' শব্দ হচ্ছে।

বিছানা থেকে পিঠটা তুলতেই বিস্ময়ে হা হয়ে গেল ওর মুখ। সারা ঘরে হাজার হাজার তেলাপোকা। প্রত্যেকটা তেলাপোকার ছোট্ট ছোট্ট চোখগুলো জ্বলছে আর কিলবিল করে নাড়াচ্ছে তাদের শুঁড়গুলো। তার সঙ্গে তারা তাদের পাখাগুলো ঝাপটাচ্ছে আর ফত ফত শব্দ করছে।

হঠাৎ সব তেলাপোকা উড়তে শুরু করল। কতগুলো আবার হাত-পায়ের ওপর বসে পড়েছে, তাদের খসখসে পা নিয়ে কিলবিল করছে। কতগুলো পাখা দিয়ে ঝাপাটা মারছে সমস্ত শরীরে।

শরীরটা ভীষণ গুলিয়ে উঠল রুদ্রের। বিশ্রী একটা গন্ধ বের হচ্ছে তেলাপোকাগুলো থেকে। বমি বমি একটা ভাব আসছে।

বেশ কিছুক্ষণ এমন হল। হঠাৎ তেলাপোকাগুলো থেমে গেল। গন্ধটাও আর নেই।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রুদ্র উঠে দাঁড়াল। হাত-পাগুলো এখনো কাঁপছে। ভীষণ পানি খেতে ইচ্ছে করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আবার লাইটের সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই থমকে দাঁড়াল। দরজার

ওপাশে কে যেন কাঁদছে। গুনগুন করে কাঁদছে, আবার মাঝে মাঝে গুমরে গুমরে উঠছে।

কিছুক্ষণ ভাবল রুদ্র। তারপর কাঁপা গলায় বলল, 'কে?'

কোনো উত্তর নেই।

রুদ্র আবার বলল, 'কে ওখানে?'

এবারও কোনো উত্তর নেই। শুধু বাচ্চা ছেলের মতো কান্নার শব্দটা আরো একটু জোরে হল।

রুদ্র স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলার ভেতর কেমন যেন খ্যাস খ্যাস করছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একবার ভিজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে।

কান্নার একঘেয়ে সুর বাজতে বাজতে হঠাৎ রাতের সমস্ত নিস্তব্ধতাকে খান খান করে বাচ্চার মতো কান্নাটা ভীষণ আর্তনাদে পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি সটাং করে খুলে গেল দরজাটা। বাইরে তাকাতেই কলজেটা লাফাতে শুরু করল রুদ্রের, সমস্ত রক্ত হিম হয়ে আসতে শুরু করল। দু'পায়ে ভর করে মানুষের মতো একজন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

অবাক বিস্ময়ে রুদ্র তাকিয়ে দেখে—মানুষটার চোখ দুটোতে থকথকে লাল জেলির মতো মাংস, চোখের মণি দুটো সুতোর মতো কিছু দিয়ে চোখের নিচে ঝুলে আছে, নাকের জায়গায় ভীষণ বড় বড় দুটো গর্ত, সেখান থেকে আগুনের মতো কী যেন বের হচ্ছে। ঠোঁটগুলো উধাও, মাড়িসহ দাঁতগুলো তীক্ষ্ণ ফলার মতো বের হয়ে আছে মুখের ভেতর থেকে। আর সমস্ত চেহারাটা লাল টকটকে, দগদগে ঘায়ে ভরা। হঠাৎ হাতের দিকে তাকাতেই রুদ্রের চোখ দুটো ফেটে আসতে চাইল। ঘাম সারা শরীরে শির-শির করছে নিঃশব্দে। ওই জানোয়ারের মতো মানুষটির হাতে একটা বাচ্চা ছেলের কাটা মাথা। মাথাটার কাটা অংশে মুখ লাগিয়ে চুষছে সে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা মাথাটা চিৎকার করে উঠছে। এভাবে কিছুক্ষণ চোষার পর সে মাথাটা দূরে কোথাও ছুড়ে ফেলল, তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল রুদ্রের দিকে।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল রুদ্র। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। নড়াচড়াও করতে পারছে না সে, যেন মেঝের সঙ্গে পা দুটো বাঁধা আছে তার।

জানোয়ারটা এগিয়ে আসছে। দ্রুত নিশ্বাস ছাড়ছে রুদ্র। দু'জনের

মাঝে দূরত্বও কমে আসছে। এখনই হয়ত তার গলাটা টেনে ছিঁড়ে চুষতে থাকবে। ধক করে উঠলো হৃৎপিণ্ডটা। একটু পর আবার পা বাড়াল। তারপর দরজায় পা দেয়ার সঙ্গে কেন যেন সে লাফিয়ে উঠল এবং ভয়ংকর এক চিৎকারে মিলে গেল।

তিন.

শরীরের ঘাম ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। এক ঝাটকা বাতাস আসতেই রুদ্র সম্বিৎ ফিরে পেল। মেঝের ওপর এতক্ষণ প্রায় অচেতন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সে।

দরজাটা হা করে খোলা। দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। ভীষণ দুর্বল লাগছে। দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনিটা লাগানোর আগেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। হঠাৎ অসম্ভব ক্লান্ত লাগল রুদ্রের। শরীরটা কেমন যেন ভারী হয়ে গেছে। নিজেকে নড়াতে ইচ্ছে করছে না। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝটকা বাতাস এল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল। ভীষণ পচা একটা গন্ধ ভেসে আসছে। অসহ্য দুর্গন্ধ। মাথাটা তুলে টেবিলে হাত রাখতেই দেখল, দরজার ফাঁক দিয়ে একটা রোমশ মাংসপিণ্ড এগিয়ে আসছে। হাতের মতো মাংসপিণ্ডটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। কেমন যেন পচা ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে। নির্বাক হয়ে গেছে রুদ্র। পাথরের মতো জমে গেছে যেন। কানের ভেতর দিয়ে গরম ভাঁপ বের হচ্ছে।

ক্রমেই এগিয়ে আসছে হাতটা। বড় বড় নখওয়ালা আঙুলগুলো কিলবিল করছে, আঙুলগুলো আবার তাজা রক্তে লাল হয়ে আছে। রুদ্র একটু পিছিয়ে গেল। হাতটা তবুও এগিয়ে আসছে, সোজা রুদ্রের গলায় বারবার। রুদ্র হঠাৎ কেমন যেন জেগে উঠল। অতিদ্রুত পিছাতে শুরু করল ও। সে যতই পিছাচ্ছে, হাতটা ততই এগিয়ে আসছে। এক সময় টেবিলের একপাশে থেমে গেল সে। আর পিছানো যাচ্ছে না। টেবিলের ওপর হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তার আগেই হাতটা তার গলা প্রায় স্পর্শ করে ফেলেছে। ঠিক তখনই টেবিলের ওপর রুদ্রের হাতের সঙ্গে

স্পর্শ লাগল আম কাটার ধারাল ছুরিটার। সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছু না ভেবে ঝট করে ছুরিটা দিয়ে আঘাত করল রোমশ পচা হাতটা বরাবর। 'খচ' করে একটা শব্দ হবার পরেই সব কিছু হঠাৎ মিলিয়ে গেল। কিন্তু প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সমস্ত বিল্ডিংটা যেন ভাঙার উপক্রম হল। দূরের এক মসজিদ থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছে।

চার.

ফুপা, ফুপু এবং ডেইজী প্রায় একসঙ্গে দৌড়ে এলেন রুদ্রের ঘরে। লাইটটা জ্বালাতেই দেখেন, রুদ্র উপুড় হয়ে বিছানার ওপর পড়ে আছে। ফুপু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে রুদ্রকে মেঝে থেকে তোলার জন্য ধরতেই ভীষণ এক চিৎকার দিয়ে ফিরে তাকাল রুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে ফুপুকে দেখে ফ্যাকাসেভাবে তাকিয়ে রইল। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে ওর।

'কি হয়েছে তোর, ভীষণ শব্দ শুনলাম?' ফুপু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

রুদ্র কোনো কথা বলল না।

ফুপা বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার, ঘরে এত তেলাপোকা মরে আছে কেন? আর দেখ–।' দরজার দিকে তাকিয়ে ফুপা বললেন, 'দরজাটায় কে যেন কুপিয়েছে।'

ডেইজী হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আম্মু-আব্বু দেখ, মেঝেতে কত রক্ত!'

ফুপু চোখ দুটো বড় বড় করে রক্তের দিকে তাকিয়ে রুদ্রের দিকে ফিরে বললেন, 'কোথাও কেটেছে নাকি তোর? অ্যা, তোর হাতে ছুরি কেন? ছুরিতে রক্ত দেখছি।'

রুদ্র তবুও কথা বলে না। শুধু ছুরির দিকে একবার তাকিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মেঝের রক্তের দিকে।

সুমর্মির শাস্তি

ব্যাপারটা কারো বিশ্বাস করার কথা না, বিশ্বাস কেউ করতেও পারছে না, অথচ ব্যাপারটা তাদের চোখের সামনেই ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে– সুমর্মিকে চুপচাপ বসিয়ে রাখা হয়েছে বারান্দায়। বারান্দার কোণার চেয়ারটাতে চুপচাপ বসে আছে সে, কিন্তু তার এখন পড়ার টেবিলে বসে থাকার কথা, স্কুলের সব পড়া শেষ করার কথা।

সুমর্মির বাবা সাবের সাহেব তাকে এভাবে বসিয়ে রেখেছেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর মেয়েকে নিয়ে তিনি তার বাড়ির সামনের মাঠটায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেন, হাত-মুখ ধুইয়ে দেন, মাথা আঁচড়িয়ে দেন,

তারপর নিজ হাতে এক গ্লাস দুধ বানিয়ে দেন তাকে। সব কিছু করার পর মেয়েকে নিয়ে তিনি পড়ার টেবিলে বসেন। স্কুলের সব পড়া শিখিয়ে দিয়ে তিনি তার ব্যবসার কাজে যান তারপর। কিন্তু আজকে তিনি এসবের কিছুই করলেন না। সব কিছু বাদ দিয়ে মেয়েকে বসিয়ে রেখেছেন তিনি বারান্দায়। সুমর্মিও মুখটা গম্ভীর করে বসে আছে চুপচাপ।

বাসার সবাই ফিসফাস করে কথা বলছে, কিন্তু কেউই কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না সাবের সাহেবকে। কারণ সাবের সাহেব হাসি-খুশি মজার মানুষ হলেও যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি খুব কঠিনভাবেই নেন। কারো কথাই তিনি তখন শোনেন না, শুনতে চান না।

সুমর্মিকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে কোথায় যেন গেছেন সাবের সাহেব। এই ফাঁকে বাসার সবাই ওর সামনে এসে দাঁড়াল। দাদু সুমর্মিকে দিদিমণি বলে ডাকেন। তিনি মুখটা খুব চিন্তাযুক্ত করে বললেন, 'দিদিমণি, তুমি কী করেছ বলো তো?'

'বলব না।' সুমর্মি মাথা নিচু করে বলল।

'বল না?' দাদু অনুরোধের ভঙ্গিতে বলেন।

'না, বলব না।'

দাদু একটু চুপ থেকে বলেন, 'তুমি কি কোনো অঙ্ক করতে পার নি?'

'আমি সব অঙ্ক পারি।' সুমর্মি গলাটা গম্ভীর করেই বলে।

'তাহলে কোনো ইংরেজি ট্রান্সলেট করতে পার নি?'

সুমর্মি আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি আমার ক্লাসের ইংরেজির সব কিছু পারি।'

'সেজন্যই তো ক্লাস ফোরের তুমি ফার্স্ট গার্ল।' দাদু মুখটা হাসি হাসি করে বলেন, 'তুমি কি কারো সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করেছ?'

সুমর্মি এবার মাথা তুলে তাকায় দাদুর দিকে। চোখ দুটো ছলছল করে বলে, 'আমি কি কখনো কারো সঙ্গে বেয়াদবি করি?'

'না, কক্ষনো করো না।' দাদু সুমর্মির কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'সেজন্যই তো ভাবছি—এমন কি করলে তুমি যার জন্যে তোমার বাবা লেখাপড়া বাদ দিয়ে তোমাকে এখানে এভাবে বসিয়ে রেখেছে? আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।'

কাজের বুয়া মাজেদা খালা বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের সুমর্মি স্কুলে কোনো একটা কিছু করেছে। স্যাররা সেটা বলে দিয়েছেন সাহেবকে, সাহেব তাই এভাবে শাস্তি দিচ্ছেন সুমর্মিকে।'

'মাজেদা খালা, স্কুলে আমি কোনো কিছু করি নি।' সুমর্মি কিছুটা রাগী গলায় বলল।

'আমারও তাই মনে হয়েছে। আমাদের সুমর্মি এতো লক্ষ্মী একটা মেয়ে, স্কুলে ও কোনো খারাপ কিছু করতে পারে না।' মাজেদা খালা মনটা খারাপ করে বলেন।

'তোমরা এখন আমার সামনে থেকে যাও তো, আমার কোনো কিছু ভালো লাগছে না।'

তিন-চার দিন আগে সুমর্মির ছোট ফুপু বেড়াতে এসেছেন বাসায়। সুমর্মিকে এভাবে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর ওর একটা হাত ধরে বললেন, 'মামণি, চলো তো, এভাবে আর বসে থাকতে হবে না তোমাকে।'

ফুপুর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সুমর্মি বলে, 'না ফুপু, বাবা আমাকে বসে থাকতে বলেছেন, বাবা না বলা পর্যন্ত আমি কখনোই এখান থেকে উঠতে পারব না।'

'আচ্ছা, তুমি তো আমার সঙ্গে কত রকম গল্প করো। এখন কি একটু বলবে– ভাইজান কেন তোমাকে এভাবে বসিয়ে রেখেছেন?'

'আমি বলতে চাচ্ছি না ফুপু, আমার লজ্জা লাগছে।'

'খুব খারাপ কিছু কি তুমি করেছ?'

'আমি সেটাও বুঝতে পারছি না, ফুপু।'

ফুপু সুমর্মির আম্মুকে ডেকে বললেন, 'ভাবী, তুমি রান্নাঘর থেকে এদিকে একটু আসো তো।' আম্মু বারান্দায় আসতেই ফুপু বললেন, 'তুমি কি কিছু জান?'

সুমর্মির আম্মু কিছু বলেন না, হাসতে থাকেন তিনি। এরই মধ্যেই খুব সুন্দর কাগজ দিয়ে মোড়ানো একটা প্যাকেট এনে সামনে এসে দাঁড়ান সাবের সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে ফুপু বলেন, 'ভাইজান, ব্যাপারটা কি বলো তো?'

সাবের সাহেব প্যাকেটটা সুমর্মির হাতে দিলেন। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে চুপি চুপি একটা কাজ করেছে। কাজটা খুবই ভালো, কিন্তু আমি মন খারাপ করেছি।'

‘কেন?’ ফুপু বেশ অবাক হয়ে বলেন, ‘কাজটা ভালো, তারপরও তুমি মন খারাপ করেছ কেন, ভাইজান?’

‘আমার এই লক্ষ্মী মেয়েটা আমাকে সব বলে, কেবল একটা জিনিস বলে নি। কয়েকদিন ধরে খেয়াল করছি, ও আমার সঙ্গে একটু কম কথা বলে। একা একা বারান্দায় থাকে, ছাদে থাকে কিংবা আড়ালে কোথাও থাকে। ব্যাপার কি? আমাকে দেখলেই কী যেন লুকায়। কাল রাতে পড়া শেষ করার পর ও যখন ওর ঘরে শুতে যায়, তখন হঠাৎ ওর ঘরে গিয়ে দেখি, কী যেন পড়ছে ও। আমাকে দেখেই জিনিসটা লুকাতে চেষ্টা করে। তার আগেই জিনিসটা দেখে ফেলি আমি।’

‘জিনিসটা কী ভাইজান?’ ফুপু খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

সাবের সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, ‘জিনিসটা হচ্ছে বই।’

‘বই!’

‘হ্যাঁ, বই।’ সাবের সাহেব সুমর্মির মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, ‘আমার মেয়ে পাঠ্য বইয়ের বাইরেও অন্য বই পড়তে চাচ্ছে, এটা তো খারাপ কিছু না, অন্যায় কিছু না। ও তো আর ক্লাসের পড়া ফাঁকি দিয়ে অন্য বই পড়ছে না। কিন্তু মেয়েটা আমাকে এসবের কিছুই বলে নি আমাকে। তাই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। সুমর্মি– ।’ সাবের সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘প্যাকেটটা খোলো তো মা।’

সুমর্মি প্যাকেটটা খুলেই ছোট-খাটো একটা চিৎকার দিয়ে বলে, ‘এত বই!’

‘হ্যাঁ, এত বই।’

‘কার জন্য বাবা?’

‘কারো জন্যই না। অনেকে আমাকে কিছু না বলে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ে তো, তাদের জন্য এনেছি।’ অভিমান করে চলে যেতে নেন সাবের সাহেব। তার আগেই সুমর্মি বাবার একটা হাত টেনে ধরে আলতো করে গালের সঙ্গে ঠেকায়। সাবের সাহেব ঘুরে দাঁড়ান। চোখ দুটো ভিজে উঠেছে তার। অভিমানটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে বুকের ভেতর থেকে। সুমর্মিকে জড়িয়ে ধরেন তিনি সেই বুকের সঙ্গে।

ভয়ঙ্কর জন্মরাত

বেশ কয়েক দিন হলো ব্যাপারটা লক্ষ করছে জর্জ। নাজমুল, মাহমুদ, নিলয় আর জাফি সারাক্ষণ ফিসফিস করে কী যে বলে। সে দূর থেকে ওদের ফিসফিসানি লক্ষ করে, কারণ কাছে গেলেই ওরা কথা বলা বন্ধ করে দেয়, আশ্চর্যের একটা ভঙ্গি নিয়ে ওরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবটা যেন নতুন কাউকে দেখছে। জর্জের তখন খুব ইচ্ছে হয়, কারণটা জিজ্ঞাসা করার, কিন্তু করে না। ভাবে, একসময় এমনি এমনি জানতে পারবে।

স্কুলের বারান্দা দিয়ে অঙ্ক স্যার যাচ্ছিলেন। বারান্দার এক কোণে জর্জকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। সে তখন ক্র্যাচে ভর

দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পাশে নাজমুলদের কথা বলা দেখছিল। স্যার আস্তে করে ওর কাঁধে হাত রাখলেন। সামান্য চমকে উঠে ও ফিরে তাকাল। স্যারকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে হেসে বললেন, 'কী করছ জর্জ?'

জর্জ একটু ইতস্তত করল। তারপর আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বলল, 'ওদের কথা বলা দেখছি স্যার।'

স্যার ওদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওদের মানে, নাজমুল, নিলয়, জাফি আর মাহমুদের?'

'জি স্যার।'

'ওরা তো তোমার বন্ধু, না?'

'খুব প্রিয় বন্ধু।'

'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা বলা দেখছ কেন, কাছে গিয়ে গল্প কর।'

জর্জ মৃদু হাসল। স্যারকে বলল না যে, ওদের কাছে গেলে ওরা কথা বলা বন্ধ করে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলে। জর্জ তাই কথাটা ঘুরিয়ে স্যারকে বলল, 'স্যার, আপনি কি ক্লাসে যাচ্ছেন?'

'না, ক্লাস শুরু হতে তো এখনো বেশ দেরি।'

'এবার নাকি বার্ষিক পরীক্ষা একটু আগে হবে স্যার?'

'হ্যাঁ, সে রকমই শোনা যাচ্ছে। তা তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে?'

'ভালো স্যার।'

'গুড, ভালোভাবে লেখাপড়া করবে।'

স্যার আর কিছু না বলে চলে গেলেন। জর্জ আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। জাফি হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে। নিলয় তা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। নাজমুল আর মাহমুদ মিটিমিটি হাসছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে ক্লাসে চলে এল।

দুই.

ক্লাস শুরু হতে এখনো কিছু সময় বাকি আছে। জর্জ ওর সিটে বসে বেশ কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বাংলা বইটি খুলে 'ইচ্ছে' গল্পটা বের করল। এটা ওর খুব প্রিয় গল্প। অমলের মতো ওরও অনেক ইচ্ছে। ওরও কোথাও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, ঘুরতে ইচ্ছে করে।

খুব মনোযোগ দিয়ে গল্পটা পড়ছিল জর্জ। মাঝেমধ্যে অমলের স্থানে নিজের কথা ভাবছিল। যদি সত্যি কোথাও বেড়িয়ে আসা যেত! মনে মনে ভাবল, বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে বাবাকে একবার বলবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি নাজমুলদের সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে আসা যায়।

'কী পড়ছিস জর্জ?'

জর্জ তাকিয়ে দেখে নাজমুল, জাফি, মাহমুদ আর নিলয় হাসছে। সে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তোরা হাসছিস যে?'

'তোকে দেখে।' জাফি বলল।

'আমাকে দেখে! আমার আবার কী দেখছিস?'

'দেখছি, দেখছি। কী যে দেখছি আমরা, ও তুই বুঝবি না।' নিলয় সুর তুলে কথাটা বলল।

'বাব্বা, কী এমন বিষয় যে আমি বুঝব না?'

'বড় মজার বিষয় জর্জ।' নাজমুল কথাটা বলে মাহমুদ, জাফি আর নিলয়ের দিকে তাকাল। ওরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। যার যার সিটে বসে পড়ল সবাই। হাজিরা খাতা হাতে বাংলা স্যার তার চিরাচরিত হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন।

তিন.

দেড়টায় স্কুল ছুটি হয়ে গেল। স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে নাজমুল বলল, 'জর্জ, ব্যাপারটা খেয়াল করেছিস, অনেক দিন হলো বসে আছি আমরা, কোনো রহস্য পাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ, কথাটা আমার মনেও কয়েকবার এসেছে।'

‘কী করা যায়, কিছু ভেবেছিস?’

‘কিছু একটা করা দরকার অবশ্য, তবে তার আগে পরীক্ষাটা শেষ হোক।’

‘চল, এবার তোর দাদুর বাড়ি সিরাজগঞ্জে যাই।’ মাহমুদ বলল, ‘শুনেছি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ছিল।’

‘ছিল নয়, এখনো আছে।’

‘পরীক্ষা শেষ– সে বহু দেরি।’ জাফি মুখে দুষ্টু-হাসি এনে বলল, ‘তার আগে ছোটখাটো হলেও কিছু করা দরকার।’

‘ বেশ, তা কী করতে চাস?’

জাফি কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিলয় বলল, ‘ সেটা ধীরেসুস্থে ভাবতে হবে।’ মাহমুদ আর নাজমুলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নিলয় বলল, ‘ তোরা কী বলিস?’

মাহমুদও একই রকম দুষ্টু-হাসি হেসে বলল, ‘তা তো বটেই।’

নিলয় চোখ দুটো সামান্য বড় করে বলল, ‘এ এলাকায় নাকি ইদ্রিস নামে এক কুখ্যাত চোর ছিল?’

‘হ্যাঁ ছিল, এখন নেই।’ জর্জ জবাব দিল।

‘আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে বলল, কাল নাকি তাকে আবার দেখা গেছে।’

‘তাই নাকি? দুই বছর আগে আমি, মাহমুদ আর নাজমুল মিলে ওকে এখান থেকে তাড়ালাম। জাফিরা তখন ছিল না, আর তোরা তো এলি কয়েক মাস হলো। তাই জানিস না, কী কৌশলে তাকে তাড়িয়েছিলাম। বড় খারাপ লোক ছিল।’

‘বগুড়ায় যে জায়গায় আমরা থাকতাম, সেখানেও একটা চোর ছিল। একদিন চোরটাকে ধরে এলাকার লোকজন মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।’ নিলয় একটু থেমে বলল, ‘আচ্ছা জর্জ, কীভাবে চোরটাকে তাড়ালি, একটু বলবি?’

‘হ্যাঁ, বলব তো বটেই, তবে আজ নয়।’

‘সেদিন অবশ্য আমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল।’ মাহমুদ বলল।

‘কেন?’

'হবে না?' নাজমুল হেসে বলল, 'শুনেছি চোরেরা নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে চালাক হয়।'

'আসলে তা-ই। তা না হলে তারা মানুষকে ফাঁকি দেবে কীভাবে।' জাফি বলল।

স্কুলের রাস্তার মোড়টা ঘুরতেই একটা লোককে দেখে জর্জ থমকে দাঁড়াল। আগে দাড়ি ছিল না, এখন মুখভর্তি দাড়ি। গালের কাটা দাগটা এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শক্ত-সমর্থ শরীরটা এখন বেশ নরম হয়ে এসেছে। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে জর্জ বলল, 'কে, ইদ্রিস চাচা না?'

'জে।' ঘোলাটে চোখে জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে তুমি বাবা?'

'আমি জর্জ।'

'ও, জরজো বাবা?'

'জি, আপনি কেমন আছেন?'

'এই বাঁইচ্যা আছি, বাবা।'

'এখন কোথায় থাকেন?'

'থাকি বাবা, যেখানে রাইত, সেখানেই কাইত। তোমরাও তাড়ায়া দিলা, আমিও শহরে গ্যালাম। কামকুমের চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা ট্রাক আইস্যা'– ইদ্রিস মিয়া তার ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে দেখিয়ে বলল, 'পাওডা নষ্ট কইর‍্যা দিয়া গ্যালো।'

জর্জ এই প্রথম খেয়াল করল, ইদ্রিস মিয়ার হাতে ক্র্যাচের মতো একটা লাঠি। হাঁটুর নিচ থেকে পা কাটা। একটু কষ্ট হলো লোকটার জন্য। বলল, 'কবে এসেছেন।'

'কাইলকা। তুমি কিছু ভাইব না বাবা, আমি ভালো অইয়া গেছি, দু-চারদিন থাইকাই চইল্যা যামু।'

'না না, ঠিক আছে। ভালো হলে কোনো প্রশ্ন নেই, যত দিন ইচ্ছা থাকুন।'

ইদ্রিস মিয়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। জর্জ বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তা দেখল। এমন সময় জাফি বলল, ' লোকটাকে এখনো দেখলে ভয় লাগে।'

'ঠিক বলেছিস।' নিলয় মুখ কুঁচকে বলল, 'বলে তো গেল ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু কখনো তো শুনি নি চোরেরা ভালো হয়?'

‘কয়েক দিন একটু সাবধানে থাকতে হবে জর্জ।’ নাজমুল বলল, ‘বলা যায় না, কোনো মতলব-টতলব থাকতে পারে।’

‘নাজমুল ঠিকই বলেছে জর্জ, হাজার হলেও খুনি টাইপের মানুষ। এদের বিশ্বাস নেই।’ মাহমুদ বলল।

জর্জ কোনো কথা বলল না। কিছুদূর গিয়ে বলল, ‘বিকেলে মাঠে এস।’

সবাই মাথাটা কাত করে যার যার বাড়ি চলে গেল।

চার.

বিকেলে মাঠের এক কোণে বসে জর্জ পাড়ার ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখছিল। নাজমুল, নিলয়, জাফি, মাহমুদ কেউই তখনো আসে নি। জর্জ একটু ভাবল। ওরা তো সাধারণত একটু আগেই আসে; কিন্তু আজ এত দেরি করছে কেন? জর্জ খেলা দেখছে আর ভাবছে।

পাঁচ.

নাজমুলদের দেখে জর্জের মা বললেন, ‘ তোমরা মাঠে যাও নি? জর্জ তো সেই কখন গেছে।’

‘জানি খালাম্মা।’ নাজমুল বলল, ‘আপনার কাছে এসেছি একটি কথা জানতে।’

‘কী কথা, বলো?’

‘শুনেছি জর্জের জন্ম নাকি রাতে হয়েছিল। খালাম্মা, আমরা জানতে চাইছি, রাত তখন কয়টা ছিল?’

‘এত কথা থাকতে ও-কথা কেন?’ জর্জের মা হাসতে লাগলেন।

‘এমনি খালাম্মা।’

‘ঠিক রাত বারোটায়।’

‘তার মানে কাল রাত বারোটায় ওর জন্মদিন পালন করা উচিত।’ মাহমুদ হাসতে হাসতে বলল।

‘হ্যাঁ, সেটাই তো উচিত। কিন্তু রাতে তো আর সেটা করা সম্ভব নয়, তাই পরের দিনই করা হয়। জর্জের মা বললেন, ‘ তোমরা বসো, আমি তোমাদের কিছু খেতে দিই।’

নাজমুল তেমন আপত্তি না করলেও বাকিরা করল। জাফি বলল, ‘খালাম্মা, আজ না। জরুরি একটা কাজ আছে আমাদের। আমরা আসি।’

ছয়.

পরের দিন স্কুলে এসেই জর্জ দেখল নাজমুল, মাহমুদ, জাফি, নিলয় কেউ আসে নি। ওরা সাধারণত একসঙ্গে স্কুলে আসে। আজ দেরি করতে করতে সে একাই চলে এসেছে। কিন্তু স্কুলে ওদের না পেয়ে একটু চিন্তা হলো তার। কোনো অসুখ হলো না তো? কিন্তু অসুখ হলে কি চারজনের একসঙ্গে হবে? কাল বিকেলে তো ওরা বাসায় এসেছিল, যদিও সে ছিল না। কিন্তু আজ স্কুলে আসছে না কেন? গভীর একটা ভাবনা নিয়ে জর্জ ক্লাসে ঢুকল।

সাত.

আজও বিকেলে ওরা মাঠে আসে নি। সত্যি সত্যি এবার চিন্তায় পড়ল জর্জ। অস্বস্তি নিয়ে প্রথমে সে নাজমুলদের বাড়ি গেল। নাজমুলের মা বললেন, নাজমুল নাকি বিকেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গেছে। জাফি, মাহমুদ আর নিলয়দের বাসায় গিয়েও একই কথা শুনল সে। জর্জ ভেবে পাচ্ছে না, ওরা কোথায় যেতে পারে? কাল ওর জন্মদিন। মা বলেছেন ওদের দাওয়াত করতে। কিন্তু কী মুশকিল, ওদের কোনো পাত্তাই নেই!

মনটা ভীষণ খারাপ করে জর্জ বাড়ি ফিরে এল।

আট.

রাত ৯টায় এসে জাফি আর মাহমুদ জর্জদের বাসায় হাজির। ওদের দেখে জর্জের মা বললেন, 'নাজমুল, নিলয় আর জর্জ তো এই কিছুক্ষণ আগে বাইরে গেল। কী নাকি একটা কাজ আছে।'

জাফি আর মাহমুদ বলল, 'তাহলে খালাম্মা, আমরা ওর ঘরে গিয়ে বসি ওরা এখনই এসে পড়বে বোধহয়।'

নয়.

আধঘণ্টা পর জর্জ বাসায় এসে জানল, জাফি আর মাহমুদ এসেছিল। মা বললেন, 'ওরা ঘরে আছে।' জর্জ ঘরে এসে দেখে ঘর ফাঁকা। মাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'তাহলে কি ওরা চলে গেল? কিন্তু না-বলে তো যাওয়ার কথা নয়!'

'আমিও তা-ই ভাবছি মা।'

দশ.

প্রতিদিনের মতো রাত ১১টায় জর্জ বিছানায় গেল। কিন্তু আজ ঘুম আসছে না। জাফি আর মাহমুদ কেন এসেছিল, জানা হয় নি। কোনো অসুবিধা হয় নি তো? নিলয় আর নাজমুল বলল, সন্ধ্যার সময় নাকি ইদ্রিস চোরকে জর্জদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। জর্জ মনে মনে ভাবল, আজ রাতে ইদ্রিস চোর কোনো কিছু করবে না তো?

এগার.

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল জর্জ। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হল। সে তেমন পাত্তা দিল না শব্দটিকে। কেবল ঘুম আসছে, এ সময় চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। ভাবল, ইঁদুর-টিদুর হবে। আর কিছুক্ষণ কাটল।

এবার একটু জোরে শব্দ হল। সত্যি সত্যি এবার জর্জের ঘুম ভেঙে গেল। কোনোরকম নড়াচড়া না করে শোয়া অবস্থায় চোখ দুটো খুলে ফেলল সে। কিছু দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না, চারদিকে অন্ধকার।

মেঝেতে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। মনে হয় কেউ হাঁটছে। জর্জের হঠাৎ ইদ্রিস চোরের কথা মনে হল। সন্ধ্যায় তো তাকে আশপাশে দেখা গেছে। ও যখন নিলয় আর নাজমুলদের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল, এই ফাঁকে সে ঘরে ঢুকে লুকিয়ে ছিল না তো? দাদু প্রায়ই বলতেন, শোয়ার আগে আশপাশে, খাটের নিচে দেখে নেয়া উচিত। কেউ পালিয়ে থাকলে ধরা পড়ে যাবে। অনেক দিন পর দাদুর কথা মনে পড়ল।

খাটের ডান পাশে খুব নিঃশব্দে হাত বাড়াল জর্জ। 'স্যাঁৎ' করে উঠল বুকটা। ক্র্যাচটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে গলাটার মধ্যে কী যেন আটকে গেল। ঢোক গিলতে পারছে না, গলা শুকিয়ে মরুভূমি।

খুব আস্তে আস্তে খাটের নিচ থেকে কিসের যেন শব্দ আসছে। শোঁ শোঁ আওয়াজ। ভৌতিক সিনেমার শব্দের মতো। শব্দটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে শব্দ হল। হঠাৎ খুট্ শব্দ করে তা থেমে গেল।

সারা গা ঘামে ভিজে গেছে জর্জের। মনে মনে ভাবল, চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু একটা লজ্জাবোধে তা করল না। হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ করে মাথার ওপরের সিলিং ফ্যানটা ঘুরতে লাগল। এই শীতের রাতে কেউ ফ্যান

চালায় না, তাই বন্ধ ছিল। কিন্তু ফ্যানের এই হঠাৎ চলাটা জর্জের বেশ ভালো লাগল। গরমটা কমে আসছে।

ফ্যান যেমন হঠাৎ চলা শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। জর্জ একটু ভেবে খাট থেকে নামার চেষ্টা করল। কিন্তু নামতে গিয়েই অনুভব করল, কে যেন পেছন থেকে শার্টটা টেনে ধরেছে। ভীষণ চমকে উঠল সে। বুকটার মধ্যে ধপ্ ধপ্ করে কেঁপে উঠল। কিন্তু দ্রুত বুকে সাহস এনে সে ডান হাতটা পেছনে আনল। তার আগেই 'স্যাঁৎ' করে কে যেন সরে গেল। জর্জ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কে?'

কোনো উত্তর এল না। পরক্ষণেই হা হা করা চিৎকারের মৃদু একটা শব্দ শুরু হল। নাকি-সুরে কে যেন কাঁদছে। জর্জ একটু সরে বসতেই খাট থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। ঠাণ্ডা মেঝে। একটা তেলাপোকা তার কাঁটা কাঁটা পা নিয়ে হাতে উঠতেই সে ছিটকে ফেলে দিল। লাইটটা জ্বালানো দরকার। কিন্তু এই অন্ধকারে সে বুঝতে পারছে না, কোন দিকে সুইচটা। হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে সে এগিয়ে গেল একদিকে।

একটা ছায়া সরে গেল চোখের সামনে থেকে। স্পষ্ট দেখতে পেল জর্জ, কেউ একজন সরে গেল। এ মুহূর্তে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। মেঝের সঙ্গে মাথাটা ঠেকিয়ে পড়ে রইল। দেয়ালঘড়ির টানা টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে।

ধীরে ধীরে দেয়ালের একপাশ ধরে জর্জ ওঠার চেষ্টা করল এবং একসময় উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে কোণার দিকে। লাইটের সুইচটা সেদিকে রয়েছে। একটু এগিয়ে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যেও টের পাওয়া যাচ্ছে, কোণার দিকে কী যেন নড়ছে। আস্তে আস্তে সেটা এগিয়ে আসছে। কলজেটা লাফাতে শুরু করেছে জর্জের। পিছিয়ে আসছে সে। কিন্তু একটু পিছিয়ে আসতেই কার সঙ্গে যেন ওর পা বেধে গেল। পড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু তার আগেই কে যেন তাকে ধরে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল মুখটা। ঠিক তখনই ১২টা বাজার ঢং ঢং শব্দ হলো দেয়ালঘড়িতে। পরক্ষণেই ঘরের লাইটটা জ্বলে উঠল এবং 'হ্যাপি বার্থ নাইট' শব্দে ভরে গেল ঘরটা। অবাক হয়ে জর্জ তাকিয়ে দেখল,

নিলয়, মাহমুদ আর জাফি বড় বড় অক্ষরে 'হ্যাপি বার্থ নাইট' লেখা আর্টপেপার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাজমুল পাশে দাঁড়িয়ে ওকে ধরে আছে। সবার মুখ হাসি হাসি। শুধু জর্জের মুখটা ঘেমে ভিজে গেছে। জর্জ মাথাটা নিচু করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে নাজমুল বলল, 'স্যরি জর্জ, সঠিক সময়েই শুভ জন্মের শুভেচ্ছা জানাতে হয়, আমরা তা-ই করেছি।'

জর্জ মৃদু হেসে বলল, 'থ্যাংকু।'

নিলয় একগোছা গোলাপ নিয়ে এগিয়ে এল। জাফি নিয়ে এল একটা বইয়ের প্যাকেট। সবার পক্ষ থেকে 'পৃথিবীর সেরা গোয়েন্দা সিরিজ'।

জর্জ আবারও বলল, 'থ্যাংকু।' একটু থেমে কিছু স্বাভাবিক হয়ে সে বলল, 'তোমরা ঘরে ঢুকলে কীভাবে?'

'খুব সহজ।' তোমাকে আমি আর নিলয় ডেকে নিয়ে গেলাম বাইরে, এই ফাঁকে জাফি আর মাহমুদ এসে হাজির, তা বোধহয় তুমি আগেই শুনেছ, কিন্তু ঘরে ওদের পাও নি। ওরা তোমার খাটের নিচে লুকিয়ে ছিল। তুমি ঘুমানোর পর ওরা দরজা খুলে দিলে আমরা ঢুকি। নাজমুল তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বলল।

'ভৌতিক একটা শব্দ শুনতে পেয়েছি, সেটা কীভাবে হল?'

সঙ্গে সঙ্গে খাটের নিচ থেকে টেপরেকর্ডারটা বের করল জাফি। তারপর তার কভারটা খুলে ক্যাসেটটা বের করে বলল, 'কাল সারাদিন অনেক খুঁজে এটি পেয়েছি।'

জর্জ আবারও মাথা নিচু করে ফেলল। মাহমুদ হেসে হেসে বলল, 'ভীষণ ভয় পেয়েছিলে, না?'

'ভীষণ না হলেও কিছুটা তো বটেই। কিন্তু বেশি রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। একবারও মনে আসে নি ঘটনাগুলো সাধারণ মানুষই করছে, কোনো অশরীরী বা প্রেতাত্মা এটি করতে পারে না।'

'স্যরি, একজন গোয়েন্দাপ্রধান হতে হলে মাঝেমধ্যে এমন পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হয় যে?' জাফি সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলো তোমরা?'

'একজন গোয়েন্দা-সহকারী হতে কিন্তু এমন পরীক্ষা তোমাকেও দিতে হবে জাফি।' জর্জ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলো তোমরা?'

ওদের চোখে একটি ভয়ের ছায়া দেখতেই জর্জ বলল, 'চলো, আজ সারা রাত গল্প করে কাটাই।'

'আমরাও তো সেটাই চাই। তবে আজ সারা রাত আমরা ভূতের গল্প বলব।' নিলয় বলল।

'ঠিক আছে।' জর্জ ঘরের জানালা খুলে লাইটটা অফ করে দিল। তারপর সবাই বিছানার ওপর উঠে বসল। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসায় ঘরে একটি আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জর্জ শুরু করল, 'এক দেশে ছিল এক বিরাট ভূত। সে ছিল খুব কুৎসিত।' জর্জ চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'জাফি তাকিয়ে দেখো, তোমার পেছনে সেই ভূত।' সঙ্গে সঙ্গে জাফি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগে জর্জ মুখ চেপে ধরে বলল, 'পরীক্ষাটা কেমন হলো জাফি?'

লজ্জায় জাফির মুখটা লাল হয়ে গেছে, কিন্তু অন্ধকারে তা দেখতে পেল না কেউ।

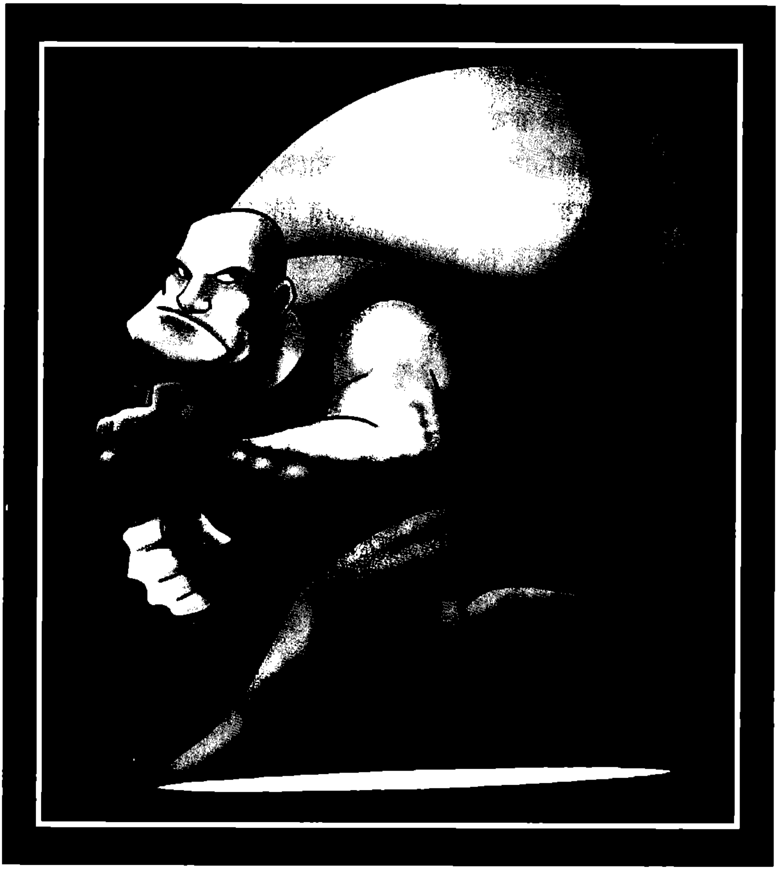

কাঁঠাল চোর

ভয়ঙ্কর এক কাণ্ড ঘটে গেছে স্কুলে। ভয়াবহ কাণ্ড। স্কুলের নতুন কাঁঠাল গাছটায় যে কয়টা কাঁঠাল ধরেছিল, তার সব চুরি হয়ে গেছে। গতকালও গাছে কাঁঠাল ছিল, যারা গতকাল স্কুলে এসেছিল তারা তাই বলছে। কিন্তু আজ এসে দেখে গাছে একটাও কাঁঠাল নেই, একদম ফাঁকা।

কথাটা হেডস্যারের কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের সমস্ত পরিবেশ গেল পাল্টে। একদম চুপচাপ তিনি। ধুম মেরে বসে আছেন তার রুমে। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। কেউ তার রুমে গেলে চলে যেতে বলছেন ইশারায়। দপ্তরী, নাইট গার্ড, কেরানি সকলেই তা দেখে থর থর

করে কাঁপছে এমনকি অন্য স্যারেরাও চুপ হয়ে গেছেন। ভয় হচ্ছে, না জানি কী আছে কার কপালে।

বেশ কিছুক্ষণ পর রুম থেকে বের হয়ে এলেন হেডস্যার। মাথা নিচু করে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে তাঁর। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন কাঁঠালগাছটির দিকে। গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর হতাশামূলক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার ফিরে এলেন তার রুমে।

পণ্ডিত স্যার সাধারণত একটু দেরি করে স্কুলে আসেন। তিনি এসে যখন এ খবরটা শুনলেন, লজ্জায় মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্যারের। লাইব্রেরি রুমের এককোণে অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন তিনি। তারপর খুব ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন হেডস্যারের রুমের দিকে।

স্কুলে হেডস্যারের রুমে যখন-তখন যাওয়ার সাহস একমাত্র পণ্ডিত স্যারই রাখেন। হেডস্যার সবার সামনে যাই হোক, পণ্ডিত স্যারের সামনে অন্যরকম। কারণ, পণ্ডিত স্যার একসময় হেডস্যারের শিক্ষক ছিলেন এবং হেডস্যারকে তিনি নাম ধরে ডাকেন।

'রশীদ কী লজ্জার কথা?' পণ্ডিত স্যার হেডস্যারের রুমে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন হেডস্যার।

'জি স্যার, এই কাঁঠালগাছটা এই এলাকার সবচেয়ে শিক্ষিত এবং ভালো মানুষ সিরাজুল সাহেব লাগিয়েছিলেন। তিনি এই স্কুলের জন্য কি-না করেছেন? গাছটা লাগানোর সময় তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, গাছের প্রথম পাকা কাঁঠালটা তিনি সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে খাবেন। আমরাও ভেবেছিলাম প্রথম যে কাঁঠালটা পাকবে সেটা ওনাকে দেব। কিন্তু–?' হতাশায় মাথাটা নিচু করে ফেললেন হেডস্যার।

পণ্ডিত স্যার হেডস্যারের সামনে চেয়ারটায় বসতেই হেডস্যারও তার চেয়ারে বসলেন। মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবছেন পণ্ডিত স্যার। হঠাৎ তিনি বেশ উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'ক্লাস এইটে আমাদের একটা ছেলে পড়ে না, কী যেন নাম, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, জর্জ, ওই যে যার এক পা অ্যাকসিডেন্টে কাটা পড়েছে। ও নাকি ক্ষুদে গোয়েন্দা? ওকে বললে কেমন হয়?'

সঙ্গে সঙ্গে হেডস্যার উঠে দাঁড়ালেন। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'ইয়েস।' দ্রুত হেডস্যার কলিং বেলটা টিপে দপ্তরিকে ডাকলেন। দপ্তরি রুমে ঢুকতেই হেডস্যার বললেন, 'ক্লাস এইটে জর্জ নামে একটা ছেলে আছে না, ওই যে ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করে, ওকে চুপচাপ ডেকে আনো তো।'

দুই.

জর্জ বেশ সাহসী ভঙ্গি নিয়ে হেডস্যারের রুমে ঢুকেই সালাম দিল স্যারদের। হেডস্যার কিছু বলার আগেই পণ্ডিত স্যার বললেন, 'তুমি নাকি গোয়েন্দা, তাহলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে কাঁঠাল চুরির কথা শুনেছ? এবার বলো, তুমি কি বের করতে পারবে এ কাজটা কে করেছে?'

'চেষ্টা করে দেখব স্যার।' জর্জ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলল।

'গুড।' হেডস্যার প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'বলো, তোমার জন্য প্রথমে কী করতে পারি?'

'স্যার, এই স্কুলের যাকে যাকে আপনার সন্দেহ হয়, দয়া করে তাদেরকে ডেকে আনুন এখানে।'

তিন.

নাইট গার্ড মতলব মিয়া, স্কুলের চারজন ছাত্র সোহেল, ফরিদ, পিপলু এবং মিজানকে হেডস্যারের রুমে ডেকে আনা হলো। জর্জ সকলের দিকে একবার তাকিয়ে হেডস্যারকে বলল, 'এ কজনই স্যার?'

'হ্যাঁ, নাইট গার্ডকে স্বভাবতই আনতে হয়েছে, আর এ চারজন হচ্ছে আমাদের স্কুলের সবচেয়ে দুষ্টু এবং বাজে ছেলে।' হেডস্যার আঙুল দিয়ে সোহেল, ফরিদ, পিপলু ও মিজানকে দেখালেন।

'স্যার, আমার দু'জন সহকারী আছে– জীম ও জারিফ। ওরা এই স্কুলেই পড়ে।'

জর্জের বলার আগেই পণ্ডিত স্যার বললেন, 'ওদেরকে আমি চিনি।' তারপর দপ্তরিকে বললেন, জীম ও জারিফকে ডেকে আনতে।

চার.

জীম ও জারিফ রুমে ঢুকতেই ওদেরকে চুপি চুপি কী যেন বলল জর্জ। ওরা ব্যাগ থেকে ডায়েরির মতো একটা খাতা ও কলম বের করল। এরপর জর্জ হেডস্যারকে চোখ দিয়ে ইশারা করে কিছু বলতেই হেডস্যার গম্ভীর ও রাগী গলায় বললেন, 'গতকাল স্কুলের কাঁঠালগাছটা থেকে সব কাঁঠাল চুরি হয়ে গেছে, এবার তোমরা বলো এই কাজটা কে করেছে?'

কেউ কিছু বলার আগেই জর্জ বলল, 'আর সে কাঁঠালগুলো পাওয়া গেছে, স্যার শুধু জানতে চাচ্ছেন কাঁঠালগুলো চুরি করেছে কে?'

পণ্ডিত স্যার আর হেডস্যার পরস্পরের দিকে তাকাতেই জর্জ মনে মনে হেসে ফেলল।

'স্যার আমি গতকাল সন্ধ্যার দিকে মিজানকে কাঁঠালগাছের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।' ফরিদ হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বলল।

মিজানের মুখটা হঠাৎ ভয়ে কালো হয়ে গেল। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মিথ্যা কথা স্যার, আমি কাঁঠাল চুরি করি নি।'

সোহেল কিছুটা চালাকিভাবে নাইট গার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার এসব ব্যাপারে নাইট গার্ডেরই তো ভালো জানা উচিত, গতকাল কী করছিলেন তিনি?'

মুখটা কাচুমাচু করে নাইট গার্ড মতলব মিয়া বললেন, 'সোহেল ভাই কিন্তু প্রায় প্রতিদিনিই ওই কাঁঠালগাছে উঠত, এটা-ওটা করত। আমার মনে হয়–।' নাইট গার্ড কথাটা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল।

'আপনি কাল কী করছিলেন?' জর্জ নাইট গার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং ইশারায় ঠিকমতো সবকিছু খাতায় নোট করতে বলল জীম ও জারিফকে।

'গতকাল বড্ড জ্বর ছিল আমার, আমি আমার ঘরে ঘুমিয়েছিলাম।'

'কথাটা কীভাবে বিশ্বাস করব, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন।' মিজান প্রায় ফোঁস ফোঁস করে কথাটা বলল।

'ফরিদ, তুমি গতকাল সন্ধ্যার দিকে মিজানকে কাঁঠালগাছের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ। এবার তুমি বল, তুমি তখন কী করছিলে?' জর্জও গম্ভীর গলায় ফরিদকে জিজ্ঞাসা করল।

ফরিদ কোনো কথা না বলে মাথাটা নিচু করে রইল চুপচাপ। জর্জ এবার পিপলুর দিকে তাকাতেই পিপলু বলল, 'ফরিদকে আমি গতকাল দুটি কাঁঠাল রিকশায় করে নিয়ে যেতে দেখেছি। আমি হলে সব কাঁঠাল নিয়ে যেতাম, আমাদের ক্লাসের সিলিং-এর ওপর বাকিগুলো লুকিয়ে রাখতাম না।'

'না, ওগুলো আমি বাজার থেকে কিনেছিলাম।' ফরিদের মুখটা সাদা হয়ে উঠল।

দ্রুত জীম এবং জারিফ জর্জের দিকে এগিয়ে আসতেই জর্জ হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিল ওদের। তারপর হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবাইকে পাশের ঘরে চলে যেতে বলুন স্যার।'

হেডস্যার ইশারা করতেই সবাই পাশের রুমে চলে গেল।

পাঁচ.

'স্যার, একটা অনুরোধ করব।' জর্জ হেডস্যারের দিকে শ্রদ্ধার চোখে বলল, 'ভুল মানুষই করে, আমি পিপলুর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।'

হেডস্যার অবাক হয়ে বললেন, 'কাঁঠাল পিপলু চুরি করেছে, এটা কী করে বুঝলে?'

'স্যার, আমি শুধু একটা মিথ্যা বলেছিলাম, কাঁঠালগুলো পাওয়া গেছে। আসলে কাঁঠালতো পাওয়া যায় নি। কিন্তু পিপলু কথা বলার সময় বলল, 'সে চুরি করলে সব কাঁঠালই নিয়ে যেত, কখনো ক্লাসের সিলিং-এর ওপর রাখত না। যেহেতু আমরা কাঁঠাল পাই নি, তাই কাঁঠাল যে ক্লাসের সিলিং-এর ওপর আছে, এটা কেউ জানি না। কিন্তু পিপলু তা জানে এবং বলে দিল ঝটপট। সুতরাং– ।'

'ডাকো তো শয়তানটাকে।' হেডস্যার প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জর্জ হেডস্যারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'স্যার আমার অনুরোধ– ।'

'আমি এখন কী করব, এবার তুমিই বল?' হেডস্যার জর্জকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওদের সবাইকে চলে যেতে বলুন স্যার। স্কুল ছুটির পর সিলিং থেকে কাঁঠালগুলো পেড়ে আনা যাবে। যদি পিপলুকে এখন ডেকে আনি এবং কাঁঠালগুলো এখনই পেড়ে আনতে চাই, তাহলে সবাই পিপলুকে কাঁঠাল চোর বলে ক্ষ্যাপাবে।'

পণ্ডিত স্যার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জর্জের একটা হাত ধরে বললেন, 'শুনেছি পিপলু নাকি তোমার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে একবার অন্যায়ভাবে আঘাত করেছিল এবং প্রায়ই তোমাকে সে ন্যাংড়া বলে ক্ষ্যাপায়, তবুও তুমি তাকে–?'

কথাটা শেষ করার আগে জর্জ বলল, 'কাউকে আঘাত করে কথা বললে যে সে কী কষ্ট পায় তা তো আমি জানি স্যার, তাই পিপলুকে কেউ চোর বললে, সেও কষ্ট পাবে। এটা আমি চাই না স্যার।'

হেডস্যার দ্রুত উঠে এসে জর্জকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি খুব ভালো জর্জ, খুব ভালো।'

'আপনারা আমাদের চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন স্যার, এই জন্যই আমরা ভালো।' জর্জের চোখে জল এসে গেছে, 'এখন আসি স্যার।'

হেডস্যারের রুম থেকে বের হতেই জর্জ, জীম ও জারিফ অবাক হয়ে গেল। স্কুলের সমস্ত ছাত্র মাঠের ভেতর জড়ো হয়ে গেছে, তারা কাঁঠাল চোরকে দেখবে। স্যাররাও ক্লাস নিচ্ছেন না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

জর্জ তার ক্র্যাচটায় ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল স্কুলের গেটের দিকে। জীম ও জারিফকে নিয়ে সে স্কুলের বাইরে চলে যাবে, বাসায় চলে যাবে এখনই, সেটা কেউ জিজ্ঞেস করার আগেই। কারণ, পিপলুকে সে এখনো বন্ধুই ভাবে। আর একজন বন্ধু হয়ে আরেক বন্ধুকে সে কখনো চোর বলতে পারবে না, কক্ষনো না।

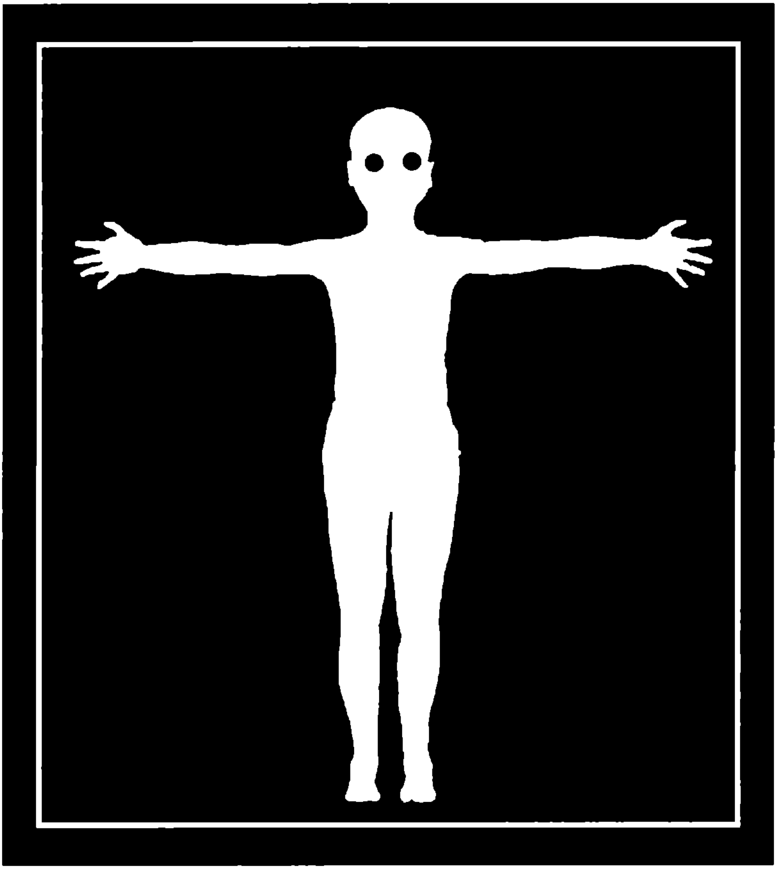

জাদুর ইঁদুর

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মিকি দেখল, ওর মা গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে। পাশে ছোট্ট ভাইটিও মার গা ঘেঁষে চার হাত-পা চারদিকে ছড়িয়ে চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে। নিশ্বাসের তালে তালে ছোট্ট ভাই নিকির লাল নাকটা একবার ফুলছে, একবার চুপছে। মিকির খুবই ইচ্ছে হল, নিকির ঐ লাল নাকটিতে একটা চুমো দিতে। যেই মনে হওয়া, অমনি সে এগিয়ে গেল নিকির দিকে। তারপর তার খুব কাছে গিয়ে সে নাকের দিকে মুখ এগিয়ে দিল। কিন্তু তার আগেই মিকির একটা লম্বা গোঁফ নিকির নাকের ভেতর যেতে সুড়সুড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে নিকি হাঁচি দিয়ে ফেলল। হাঁচি দেয়ার

পর সে আবার পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মা একবারের জন্য চোখ খুলল। কিন্তু চালাক মিকি তার আগেই দ্রুত নিকির পাশে বসে পড়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। ছেলে দুটো ঘুমাচ্ছে– এই সান্ত্বনা বোধে মা ওদের গালে জিহ্বা ছুঁয়ে আদর করে পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে মিকি চোখ খুলল। তারপর ওভাবেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। পরিবেশ কেমন তা বোঝার চেষ্টা করতেই মার নাক ডাকা শুনে বুঝতে পারল মা ঘুমিয়ে আছে। কিছুটা শঙ্কায় সে উঠে দাঁড়াল। খুব নিঃশব্দে তারপর মার ওপাশে এগিয়ে গেল। সত্যি মা ঘুমিয়ে আছে। মুচকি একটা হাসি দিয়ে মিকি মার দিকে একটা 'ফ্লাইং আদর' ছুড়ে দিল। তারপর রাজকীয় একটা ভঙ্গিতে নিশ্চিত হয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সুন্দর সকাল। শান্ত চারদিক। ঝিরিঝিরি ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মিকি হাত-পাগুলো টিমটিম করে তার জড়তা ছাড়াল। তারপর হা করে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে সামনের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

সামনের বাড়িটা একজন জাদুকরের বাড়ি। খুব সুন্দর নাকি বাড়িটা। বিরাট একটা বাগান আছে ওই বাড়িটার ভেতর। মিকি বহুদিন ওই বাড়িটার ভেতর যেতে চেয়েছে, কিন্তু মা বারবার নিষেধ করেছে। ওই বাড়িটা না-কি ভয়ঙ্কর এক বাড়ি। সেখানে গেলে কেউ আর কোনোদিন ফেরত আসে না।

মিকি মার কথা শুনেছে আর মনে মনে ভেবেছে, কী আছে ওই বাড়িটার ভেতর? সেখানে কি ভূত আছে কিংবা বিরাট বিরাট সাপ? দৈত্যও থাকতে পারে আবার মানুষখেকো রাক্ষসও থাকতে পারে। তাই হয়তো মা এত নিষেধ করেছে।

ফুড়ুৎ করে একটা দোয়েল পাখি এসে মিকির সামনে লেবু গাছটির ডালে বসল। মিকি তা খেয়াল করল না। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ দোয়েলটি 'চিউ' করে বলল, 'গুড মর্নিং, মিকি।'

মিকি চমকে উঠে বলল, 'গুড মর্নিং।' সে আবার ওই বাড়িটার দিকে তাকাল।

'ওই বাড়িটার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন মিকি?'

মিকি খুব ধীরে ওর ঘাড়টা ঘুরিয়ে পাখিটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আচ্ছা তুমি কি ওই বাড়িটা সম্বন্ধে কিছু জান?'

দোয়েলটি ভীত চোখে বলল, 'জানব না মানে, ভীষণ ভয়ের বাড়ি ওটা।'

'ভয় কিসের?'

'ওখানে এক জাদুকর থাকে। বড্ড দুষ্ট ও পাজি ওই জাদুকরটা।'

'ওই জাদুকর কি সবাইকে মেরে মেরে খায়?'

'বোকা ছেলে! খেতে যাবে কেন? ও সবসময় মানুষ, পাখি ছাড়াও বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষতি করে।'

'তাই বুঝি ওর বাড়ির গাছের ডালে কোনো পাখি বসে না।'

'হ্যাঁ। তুমি তো উড়তে জান না, আমরা উড়ে দেখেছি ওই বাড়িটার ভেতর। খুব সুন্দর একটা বাগান আছে ওখানে। যা সুন্দর সব ফুল গাছ।'

'আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে ওখানে যেতে।'

'খবরদার এ কাজটি কখনও করো না। তোমার মতো একটা বিড়াল বেশ কয়েকদিন আগে একবার ওই বাগানে ঢুকেছিল, সে আর ফিরে আসেনি।'

মিকি চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাই তোমাকে আবারও বলছি, ভুলেও ওখানটায় যেও না।'

'ধন্যবাদ তোমাকে।'

'তোমাকেও ধন্যবাদ। তা মিকি, তুমি এখন থাক। আমার আবার খাবারের খোঁজে যেতে হবে। তুমি তো জান, আমার দুটো বাচ্চা হয়েছে।'

'ওরা কেমন আছে?'

'ভালো, কিন্তু সবসময় শুধু খেতে চায়।'

'বেশ তো খাওয়াবে।'

'একদিন বাসায় বেড়াতে এস মিকি, বাচ্চা দুটোকে দেখে যেও।'

'আচ্ছা।'

দোয়েলটি উড়ে চলে গেল। মিকি কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার বাড়িটার দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবছে, কী আছে ওই বাড়িটার ভেতর? খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

মিকি ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেল। তারপর বাড়িটার কাছাকাছি যেয়ে

দাঁড়িয়ে পড়ল। কী করবে এ মুহূর্তে ভেবে পাচ্ছে না। ভীষণ ভয়ও করছে আবার বাড়ির ভেতর যেতেও ইচ্ছে করছে। সে আস্তে আস্তে বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে যে বড় আমগাছটা আছে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর চারদিকে একবার দেখে নিল। না, আশপাশে কেউ নেই। মিকি গাছে ওঠার জন্য যেই এক পা গাছে রেখেছে সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলল, 'সুপ্রভাত মিকি।'

কাঁপা কাঁপা স্বরে মিকিও বলল, 'সুপ্রভাত। ও তুমি।'

'কেমন আছ মিকি?'

'ভালো। তুমি?'

'আমিও। প্রজাপতিরা কখনও খারাপ থাকে না।'

'তা বটে। তোমরা যেখানে খুশি উড়ে যেতে পার, যে ফুলে ইচ্ছে বসে মধু খেতে পার। তোমাদের কত আনন্দ।'

'তাই বুঝি? তোমার বুঝি কোনো আনন্দ নেই।'

কিছুটা অভিমানের স্বরে মিকি বলল, 'না, আমার কোনো আনন্দ নেই।'

'ও মা, তা কেন?'

'আমার খুব ইচ্ছে এই বাড়িটার ভেতর যাব, কিন্তু ভয় লাগছে।'

'খবরদার মিকি, কখন এ কাজ করবে না।' প্রজাপতিটা বেশ জোরে ধমকে উঠল। 'ভয়ঙ্কর বিপদ আছে ওখানে।'

মিকি ফ্যালফ্যাল করে তাকাতেই প্রজাপতিটা আবার বলল, 'জান মিকি, ওই বাড়ির ভেতর কি সুন্দর একটা বাগান আছে, আর বাগানে কি সুন্দর সুন্দর ফুল। কত মধু আছে ঐ ফুলে। কিন্তু কেউ যায় না ওখানে।'

'কেন?'

'কে চায় মরতে, বল।'

'খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ওখানে, না?'

'কেন গন্ধ পাচ্ছ না, কী মিষ্টি গন্ধ চারদিকে?'

মিকি হাহ্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেই প্রজাপতিটি বলল, 'তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি মিকি, কিন্তু কী করব বল? আচ্ছা আজ আসি মিকি। আমার আবার আজ একটু তাড়া আছে। কারণ, জর্জদের বাগানে অনেক ফুল ফুটেছে, যাই পেট ভরে মধু খেয়ে আসি।'

'তুমি সেই পিচ্চি গোয়েন্দা জর্জ-এর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো ছেলে জর্জ।'

'আসলেই ভালো।'

মিকি প্রজাপতিটির উড়ে যাওয়া দেখল। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। আবার একটু ভয়ও লাগছে। মা ঘুম থেকে উঠে পড়ল না তো। ঘুম থেকে উঠে মা যদি তাকে দেখতে না পায়, তাহলে মা খুব চিন্তা করবে।

এলোমেলো কিছুক্ষণ ঘুরল মিকি। তার কোনো কিছু ভালো লাগছে না। যতক্ষণ না সে বাড়ির ভেতর যেতে পারছে, ততক্ষণ তার শান্তি নেই। একমনে সে রাস্তার পাশ দিয়ে পায়চারি শুরু করল। এমন সময় একটা কাক উড়ে যেতে যেতে বলল, 'কী ভাবছ মিকি?'

মিকি চোখ তুলে তাকাতেই দেখল কাকটি হাসতে হাসতে উড়ে যাচ্ছে।

সকালবেলা সবাই ব্যস্ত। শুধু তারই কোনো কাজ নেই। তার তো খাবারের সন্ধানে যেতে হয় না। মা-ই সব কিছু করে।

মিকি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, কে যেন দৌড়ে তার দিকে আসছে। কাছে আসতেই দেখল পুশি। মিকি খুব খুশি হয়ে বলল, 'কেমন আছ পুশি?'

'ভালো না।'

'কেন?' মিকি চোখদুটো বড়বড় করে ফেলল।

'তুমি ইদানীং আমার সঙ্গে আর খেলছ না কেন?'

'কেমন যেন লজ্জা লাগে, বড় হয়ে যাচ্ছি তো তাই।'

'পুরুষ বেড়ালের আবার লজ্জা থাকে নাকি, লজ্জা থাকে তো আমাদের মতো মেয়ে বেড়ালদের।'

'তবু কেমন যেন লজ্জা লাগে।'

'তা এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার খোঁজেই আসছিলাম। এখনই চলে যাব। বাড়িতে অনেক কাজ। কারণ আজ আমার জন্মদিন তো, তাই তোমাকে দাওয়াত করতে এসেছি। খালাম্মা, নিকি সবাইকে নিয়ে বিকেলে আসবে কিন্তু তুমি।'

মিকি ঘাড়টা শুধু কাত করল।

'শোনো, তুমি না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু কেক কাটব না।'

'আচ্ছা আমি আসব।'

পুশি চলে যেতেই মিকি আমগাছটা বেয়ে উপরে উঠল। তারপর দেয়ালের ওপর লাফ দিয়ে নামল। সেখানে বসে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সে। তারপর টুক করে বাগানের ভেতর লাফ দিল। কি মিষ্টি গন্ধ, চারদিকে কত লাল নীল ফুল! কত সুন্দর সুন্দর গাছ!

সব কিছু দেখতে দেখতে মিকি একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের কাছাকাছি যেতে সে দেখল, ঘরের চারদিক বন্ধ, শুধু উপরে একটা জানালা খোলা আছে। সে অনেক কষ্টে সেই জানালার কাছে দাঁড়াল। তারপর একটু স্থির হয়ে ভেতরের দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠল। ইয়া লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা একটা বুড়ো লোক চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে। লোকটা আলখেল্লার মতো কী যেন পরে আছে। তার পাশে একটা লম্বা কালো লাঠি।

মিকি বুঝতে পারল, এই লোকটাই জাদুকর। নিশ্চয় সে ওই লাঠি দিয়ে জাদু দেখায়। মিকি জানালার পাশে বসেই ঘরের ভেতরের সবকিছু দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ সে একটা র‍্যাক-এর ওপর অনেক কাচের পাত্র দেখতে পেল। কাচের পাত্রগুলো ভালোভাবে দেখতেই তার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল। একটা পাত্রে সাদা সাদা বেশকিছু চিনির ইঁদুর। তার মুখে পানি এসে গেল। ইস, যদি সে ওগুলো খেতে পারত। মিকির খুব লোভ হলো।

খুব নিঃশব্দে মিকি ঘরের ভেতর চলে এল। তারপর ওই র‍্যাকটা বেয়ে উপরে উঠে এল। চিনির ইঁদুরের পাত্রের কাছে এসেই ওর মুখে আবার পানি এসে গেল। পেটের ভেতরও কেমন যেন গুড়গুড় করতে লাগল। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

মিকি কাচের পাত্রটা ভালোভাবে দেখতে লাগল। পাত্রের গায়ে লেখা আছে, 'কান বড় করার ইঁদুর!' কিন্তু সে তা বুঝতে পারল না। কারণ মিকি পড়তে জানে না।

আস্তে আস্তে মিকি পাত্রটার ছিপি খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মিষ্টি একটা গন্ধ পেল সে। কোনোকিছু ভাবার আগেই সে টুক করে একটা ইঁদুর

খেয়ে ফেলল। কী দারুণ মজা! আনন্দে মিকির চোখে পানি এসে গেল। সে আর একা ইঁদুর খেল। এভাবে মজায় মজায় সে সাতটি ইঁদুর খেয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মিকি তার কান দুটিতে কেমন যেন শিরশির অনুভব করল। সে তার থাবা দিয়ে কান দুটো স্পর্শ করতে চাইল। কিন্তু কান দুটো সে স্পর্শ করতে পারল না। কানটা কেমন যেন বড় হয়ে গেছে। মিকি টের পাচ্ছে, শিরশির করতে করতে তার কান দুটো আরও বড় হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ভারী লাগছে মাথাটা। খুব কান্না পাচ্ছে এখন মিকির।

কিছুক্ষণ ভেবে মিকি লাফ দিয়ে নিচে নামল। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। মায়ের কথা ভীষণ মনে পড়ছে। মা কতদিন এখানে আসতে নিষেধ করেছে, কিন্তু সে শোনেনি। মিকি ভাবছে, সে কি তার মাকে দেখতে পাবে না, নিকিকেও না। আজ বিকেলে পুশির জন্মদিন। পুশি তার জন্য অপেক্ষা করবে। 'ম্যাঁও' করে ডুকরে কেঁদে উঠল মিকি।

ভীষণ ভয় করছে তার। সে কি মরে যাবে? দোয়েল, প্রজাপতি ওদের কথাই কি তাহলে ঠিক? মিকি জোরে জোরে কেঁদে উঠল।

এমন সময় জাদুকরটা আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। মিকি ভয়ে লুকিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু সে যেতে পারল না। কান দুটো ভীষণ বড় এবং ভারী হয়ে গেছে। সে তেমন নড়তে পারছে না। সে আবার কেঁদে উঠল, তাহলে কি সে এখানেই মরে যাবে?

ভাবতে ভাবতে মিকি সাহস করে জাদুকরটির দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। তারপর তার পায়ের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ সে জাদুকরের পা খামছে ধরে বলল, 'আমার কান ছোট করে দাও, আমার কান ছোট করে দাও।'

মিকির খামছিতে জাদুকরটা চমকে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। তারপর তার পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখল, একটা ছোট্ট বেড়াল কাঁদছে। তার কান দুটো ভীষণ বড় হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাদুকরটা কাচের পাত্রের দিকে তাকাল। মুচকি হেসে সে বলল, 'কী হে পিচ্চি ছানা, নিশ্চয় ওখানকার ইঁদুরগুলো খেয়েছ?'

মিকি কাঁদতে কাঁদতে মাথা উঁচু-নিচু করল।

'কেন খেয়েছ?'

'ওগুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিল, আর খেতেও দারুণ মজার ছিল, তাই খেয়েছি।'

'তুমি ভুল করেছ।'

মিকি ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।'

হো হো করে হাসতে হাসতে জাদুকর বলল, 'পাত্রের গায়ে একটা লেখা ছিল, তুমি পড়তে পার না?'

'না, আমি পড়তে পারি না।'

'দেখলে তো, লেখাপড়া না জানলে কী হয়। এখন থেকে লেখাপড়া শিখবে কেমন?'

'আচ্ছা, তার আগে আমার কান ঠিক করে দাও।'

জাদুকরটি আস্তে করে মিকিকে কোলে তুলে নিল। তারপর ডান হাত দিয়ে মিকির কান দুটো চেপে ধরে বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগল। শেষে খুব জোরে জোরে বলল,

'পাত্রের ভেতর ইঁদুরগুলো যাও চলে যাও ভেগে,
কান দুটো ছোট হয়ে যাও, যেমন ছিল আগে।'

সঙ্গে সঙ্গে তার কান দুটোতে ভীষণ শিরশির অনুভব করল মিকি এবং কিছুক্ষণ পর দেখল, তার কান দুটো আগের মতো হয়ে গেছে। তিড়িং করে মিকি তখন জাদুকরের কাঁধে চড়ে বসল। তারপর তার গালের সঙ্গে মুখটা ঘসে বলল, 'থ্যাংকু জাদুকর।'

জাদুকর মিটিমিটি হেসে বলল, 'নিশ্চয় তোমার ক্ষুধা পেয়েছে!'

মিকি লজ্জায় মাথাটা নিচু করে ফেলল।

হাসতে হাসতে জাদুকর আবার বলল, 'লজ্জার কিছু নেই পিচ্চি।'—বলেই তার লাঠি দিয়ে মেঝেতে একটা টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা মেঝেতে প্লেটের ভেতর শত শত মাছ ভাজা দেখতে পেল মিকি।

মিকির মুখে আবার পানি এসে গেল। জাদুকর কিছু বলার আগেই সে খপ খপ করে সেগুলো খেতে লাগল। তাই দেখে জাদুকরটি আবার হো হো করে হেসে উঠল।

খাওয়া শেষে মিকি বলল, 'এখন আসি জাদুকর।'

'আবার এস।'

জাদুকরটি দরজা পর্যন্ত মিকিকে এগিয়ে দিল। মিকি কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকাল। তারপর জাদুকরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি মাঝেমাঝে এখানে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, আসতে পার। সঙ্গে তোমার বান্ধবী পুশিকেও নিয়ে আসতে পার।'

'পুশির কথা তুমি জানলে কী করে?'

'জাদুকররা সব জানে।'

সঙ্গে সঙ্গে মিকি জাদুকরকে একটা 'ফ্লাইং চুমো' ছুড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি খুব ভালো, জাদুকর।'

জাদুকর আবার হেসে উঠল। মিকি আবার দৌড়াতে লাগল। কারণ, মায়ের ঘুম ভাঙার আগেই তাকে বাড়ি পৌঁছতে হবে।

[বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

দুষ্টু ছেলেগুলোর আজ মন খারাপ

সাদাবদের অঙ্ক স্যারের নাম কফিল উদ্দিন হাওলাদার। চার মাস আগে এ স্কুলে জয়েন করেছেন তিনি। প্রথম দিন হেডস্যার যখন তাঁকে নিয়ে ক্লাসে ঢোকেন তখন সবাই ভেবেছিল নতুন কোনো দারোয়ান। ক্লাস সিক্সের কেউই ভাবে নি উনি তাদের নতুন স্যার, তাও আবার যেই সেই স্যার না, অঙ্ক স্যার। স্যারের শার্ট-প্যান্টের যা অবস্থা ছিল তাতে কোনোভাবেই তাকে স্যার মনে হয় নি, এমনকি পিওনও।

পরিচয় করিয়ে দিয়ে হেডস্যার ক্লাসে রেখে গেলেন অঙ্ক স্যারকে। স্যার খুক করে একটু কেশে সবার দিকে একপলক তাকালেন। সবাই

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে স্যারের দিকে। ওদের বিশ্বাসই হচ্ছে না এই অগোছালো মানুষটা তাদের স্যার হতে পারে! সামনের সব ছাত্রের একইরকম চাহনি দেখে স্যার হয়তো কিছু একটা বুঝতে পারলেন। তিনি আবার খুক করে একটু কাশলেন। তারপর বেশ লাজুক স্বরে বললেন, 'তোমরা তো হেডস্যারের মুখেই আমার নাম শুনলে, তবুও আমার নামটা আমি আবার বলছি। আমার নাম কফিল উদ্দিন হাওলাদার। আচ্ছা, আমাকে দেখে তোমাকের কি কিছু মনে হচ্ছে?'

কিছুটা লাফ দিয়ে উঠে রিসাদ বলল, 'জি স্যার। আপনার কফিল নাম শুনে আমাদের কফির কথা মনে হচ্ছে। এ মুহূর্তে খুব কফি খেতে ইচ্ছে করছে আমাদের।'

ক্লাসের সবাই হেসে উঠল। মাথা নিচু করে ফেললেন স্যার। একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রিসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার নামটা কি আমি জানতে পারি?'

'রিসাদ।'

'শুধু রিসাদ?'

'না, আরো কিছু আছে। কিন্তু সেগুলো বলতে ইচ্ছে করে না আমার।' খুব বিরক্ত হয়ে বলে রিসাদ।

'খুব সুন্দর নাম তোমার।' রিসাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে স্যার আবার সবার দিকে বললেন, ' তোমরা তো জানো আমি তোমাদের কোন সাবজেক্ট পড়াব?'

পেছনের বেঞ্চ থেকে নোমান বলল, 'অঙ্ক।'

'হ্যাঁ, অঙ্ক।' স্যার মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'অঙ্ক তোমাদের কেমন লাগে?'

কেউ কিছু বলার আগেই রিসাদ আগের মতো লাফিয়ে উঠে বলল, 'জঘন্য। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যে ব্যাটা এই অঙ্ক আবিষ্কার করেছে তাকে গুলি করে মারা উচিত ছিল।'

কিছু বললেন না আর অঙ্ক স্যার। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি রিসাদের দিকে এবং মনে মনে কী যেন বললেন, ঠিক বোঝা গেল না তা।

দুই.

সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরের দিন স্যার খুব সুন্দর পোশাক পরে ক্লাসে এলেন। একেবারে ঝকঝকে তকতকে শার্ট-প্যান্ট, মনে হচ্ছে এই মাত্র কিনে এনেছেন তিনি মার্কেট থেকে। ক্লাসে ঢুকেই একেবারে রিসাদের সামনে দাঁড়ালেন স্যার। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা কথা বলা দরকার তোমাদের– আমি শুধু তোমাদের অঙ্কই শেখাব না, তোমাদের অনেক সমস্যার সমাধানও করে দেব।'

তিন মাস পর সাদাবদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়ে গেল। রিসাদ এবার অঙ্কে পেয়েছে সাতাত্তর, অথচ এর আগের পরীক্ষায় ও পেয়েছিল মাত্র আটাশ। তার চেয়েও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে রিসাদ সবচেয়ে শান্ত ছেলে হয়ে গেছে! অঙ্ক স্যার কী জাদুবলে সবকিছু পাল্টে ফেলেছে ওর। শুধু ওর না, ক্লাসের অনেকেরই।

তিন.

বেশ কয়েকদিন ধরে ভীষণ একটা সমস্যায় পড়েছে সাদাবরা। ক্লাসে ওরা তাই খুব মন খারাপ করে বসে থাকে। ব্যাপারটা টের পেয়েছেন অঙ্ক স্যার। ক্লাসে এসে তিনি একদিন বললেন, 'সাদাব, তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বল না, সবসময় সত্য কথা বল। আজও একটা সত্য কথা বল তো– কয়দিন ধরে দেখছি তোমাদের মন খুব খারাপ, কেন বল তো?'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল সাদাব, কিছু বলল না। স্যার রিসাদের দিকে তাকালেন। সেও বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু সাদাবের মতো চুপ হয়ে রইল।

স্যার ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'বলতে কি কোনো সমস্যা আছে তোমাদের?'

'ঠিক সমস্যা না... ।' মাথা চুলকাতে চুলকাতেই বলল সাদাব।

'ওকে, আজই তোমাদের বলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আরো একটু ভাবো, ভাবার পর যদি মনে হয় আমাকে বলা যায় তাহলে বলো।' স্যার তাঁর চেয়ারে বসে হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা দিন অঙ্ক না করলে কী হয়?'

'কিছুই হয় না।' পেছনের বেঞ্চ থেকে রনি বলল।

'ঠিক বলেছ, কিছুই হয় না। আজ তাই অঙ্কও করা হবে না, কোনো কিছু শেখানোও হবে না। আজ আমরা গল্প করব।' স্যার আয়েশ করে টেবিলে হাত রেখে ভর দিয়ে বসলেন।

চার.

পিপলুদের বাসার ছাদে বসে ছিল ওরা। এমন সময় কিছুটা দৌড়ে এসে রিসাদ বলল, 'আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই, একটা খালি জায়গা পেয়েছি, ওখানে খেলতে পারব আমরা, খেলার প্র্যাকটিস করতে পারব আমরা।'

সাদাব লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'সত্যি পেয়েছিস? যাক বাঁচা গেল। এ চার মাসে অঙ্ক স্যার আমাদের এত সুন্দর করে পড়িয়েছেন। স্যার সেদিন বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে একটা টিম গঠন করবেন, সেই টিম নিয়ে উত্তরপাড়ার স্কুলের সঙ্গে খেলা দেবেন।'

'কিন্তু স্যার তো জানেন না আমাদের একটা টিম আগে থেকেই আছে। খেলার মাঠের অভাবে খেলতে পারছিলাম না আমরা।' রিসাদ বলল।

'না খেলতে পেরে খেলা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম আমরা।' পিপলু খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'তা মাঠটা কোথায় পেয়েছিস?'

'তেইশ নম্বর রোডের মাথায় বড় একটা প্লট খালি আছে, ওখানে খেলা যাবে।'

'ও হ্যাঁ, আমিও দেখেছি জায়গাটা, মনেই ছিল না জায়গাটার কথা।' সাদাব উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে বলল, 'এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কাল স্কুলে যাওয়ার সময় জায়গা দেখতে যাব আমরা, কী বলিস?'

পাঁচ.

স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দশ-বারো বছরের নয়টা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তেইশ নম্বর রোডের খালি প্লটটার সামনে। ওরা কাঁদছে, সবাই এক সঙ্গে নীরবে কাঁদছে। ঝরঝর করে পানি পড়ছে ওদের সবার চোখ দিয়ে। ওরা খুব কষ্ট নিয়ে জলভরা চোখে দেখছে– খালি প্লটটার সামনে একটা ডেভলপার

কম্পানির সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। কী একটা যন্ত্র নিয়ে মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে প্লটটার। এখানে একটা দশতলা বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হবে আগামী সপ্তাহে।

অভিমান আর কষ্ট নিয়ে সাদাবরা স্কুলে যায় নি আজ। চুপচাপ বসে আছে ওরা টোকনদের পুরনো বাড়ির উঠোনে। ওদিকে অঙ্ক স্যার হন্যে হয়ে খুঁজছেন ওদের। দুষ্টু ছেলেগুলোকে আজ ক্লাসে দেখতে না পেয়ে মনটা পুড়ছে তাঁর, ভীষণভাবে পুড়ছে।

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net